বাজীমাৎ

বাজীমাৎ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭
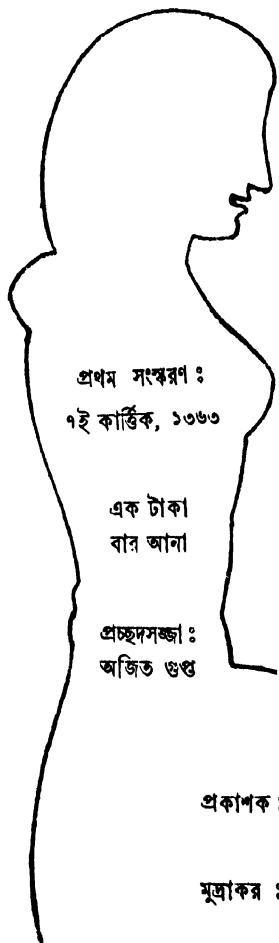
প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৩

এক টাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

জীবনে চলার পথে প্রতারিত জনসাধারণ

এবং

দুর্ভাগ্যবশত প্রতারণার ঘৃণিত জীবিকা

গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন যাঁরা

তাঁদের সকলের উদ্দেশে

এই সংকলনের গল্পগুলো শুধু গল্পই নয়, এর সব কাহিনীই সত্য-ঘটনামূলক। তবে পাত্র-পাত্রীর নাম ও স্থান-কাল গল্পে পরিবর্তন করা হয়েছে।

কয়েকটি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সংবাদ দু-একখানি সংবাদপত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশিতও হয়েছে। তাই প্রশ্ন হতে পারে, এগুলো আবার গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করার সার্থকতা কী? তার উত্তরে বলবো যে, এ রচনার যদি কোন সাহিত্য-মূল্য থাকে তা হলেই এর সার্থকতা। সংবাদ আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। দৈনিক-পত্রে প্রকাশিত সাধারণ সংবাদের মূল্য মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, কিন্তু সেই সাধারণ সংবাদও যখন সাহিত্যের রসে চোলাই হয়ে সৃজনধর্মী রচনার স্বাক্ষর বহন করে, তখন তার আবেদন হয়ে ওঠে চিরকালের। সে প্রয়াস এ-গ্রন্থে কতোটা সফল হয়েছে সে বিচারের ভার পাঠকের ওপর।

আরো একটি কথা। আমার এ রচনাগুলো পরোক্ষে মানুষের একটি মহৎ উপকার সাধন করবে বলে আমার ধারণা। সেটি হচ্ছে এই, যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে উপজীবিকা হিসেবে প্রতারণার পিচ্ছিল পথ গ্রহণে বাধ্য করে, তার অবসান যে একান্ত প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবহিত হয়ে উঠবে।

গ্রন্থকার

কর্মখালি

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছুকালের মধ্যেই। নিষ্প্রদীপের যুগ পেরিয়ে শহরের মানুষ আবার রাত্রির অন্ধকারে পথে-ঘাটে সবেমাত্র আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়ে খবরের কাগজে একটা কর্মখালির নোটিশ বেরুলো ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজের জন্যে আবেদন-পত্র চেয়ে। আবেদন-পত্র আহ্বান করা হলো বক্স নম্বরে।

যুদ্ধের ছাঁটাই বেকারের সংখ্যা তখন অজস্র। চাকরি চাই, চাকরি চাই রব সর্বত্র। 'ছাঁটাই করা চলবে না' আওয়াজ মিছিলে মিছিলে যতোই উঠুক না কেন, কারখানায় কারখানায় চলেছে ছাঁটাইয়ের হিড়িক।

এমনি অবস্থায় কর্মখালির প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই বেকার কর্ম-প্রার্থীদের সামনে আশার আলেয়া সৃষ্টি করে। আলেয়া বলছি এ জন্যে যে, এ কালে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবার আগেই কর্মখালির বিজ্ঞাপিত শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে। শুধু রীতি-রক্ষার জন্যেই বিজ্ঞাপন।

কিন্তু এ তথ্য সর্বজনবিদিত হলেও মন যে মানে না! তাই কর্মখালির কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিজের যোগ্যতার আংশিক মিল খুঁজে পেলেও কোন বেকারই একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিতে কসুর করে না। এমন কি, আট আনা বা এক টাকার ডাকটিকিট সহ আবেদন করতে বলা হলেও নয়।

ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজের বিজ্ঞাপনেও তাই সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। চাকরিও পাকা, মাইনেটাও ভালো। কাজেই ভালো সাড়া

তো স্বাভাবিক ভাবেই পাবার কথা। মিউনিসিপ্যালিটির কাজকে আধা-সরকারি কাজও বলা যেতে পারে। বড়ো মিউনিসিপ্যালিটি হলে তো কথাই নেই। অনেক সময় সরকারি কাজের চাইতেও এক-একটা মিউনিসিপ্যালিটির চাকরিতে বেশি সুযোগ-সুবিধে। তাই অসংখ্য দরখাস্ত পড়লো ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে প্রচারিত হবার ফলে।

নন্দ সেন তো খুব খুশি। কিন্তু চিন্তাও বড়ো কম নয়। এর মধ্যে কতো লোককে তিনি এপয়েন্টমেন্ট দেবেন এবং কাদের দেবেন না এই তাঁর ভাবনা। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, যে-সব দরখাস্তের সঙ্গে নামকরা লোকের সুপারিশ রয়েছে তাদের ডাকা ঠিক হবে না। আর বেশি লেখাপড়া জানা লোকদেরও নয়। কারণ তাতে রিস্ক্‌টা বড্ড বেশি হয়ে যাবে। সে ভাবেই তিনি সমস্ত দরখাস্ত বাছাই করে নিলেন এবং মোট একশ জনকে চাকরি দেওয়া হবে ঠিক হলো।

ফেব্রুয়ারী মাস। বিশ তারিখে মনোনীত একশ লোকের ঠিকানায় ঠিক ঠিক চিঠি চলে গেল। চব্বিশ তারিখের মধ্যে আড়াই শ করে টাকা সিকিউরিটি রেখে কাজে যোগ দিতে হবে। হোক না আড়াই শ টাকা জমা দিতে, চাকরিটা তো পাকা। কাজেই এদের সকলেরই মনে অসীম আনন্দ। যার যে ভাবে সম্ভব জমার টাকাটা সবাই সংগ্রহ করে ফেলে দু-একদিনের মধ্যেই। কেউ কেউ বাপ বা শ্বশুরের কাছ থেকে নিয়ে, আবার অনেকে ধার করে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনেই নন্দ সেনের বাড়িতে গিয়ে একের পর এক উঠতে থাকে।

হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির মতোই বাড়ি বটে! একেবারে সাহেবি আদব-কায়দা। নতুন চাকুরেদের মধ্যে কথাবার্তাও হয় এই নিয়ে।

বাড়িটা মিউনিসিপ্যালিটির ভাড়া নেওয়া বাড়িও হতে পারে। বাড়িতেই ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস। সে তো ভালোই, সব দিক থেকেই ভালো।

একেবারে পাক্কা সাহেব নন্দ সেন। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা দশটা বাজতেই সেন সাহেব তাঁর অফিসে এসে বসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডাক শুরু হয় আমন্ত্রিত চাকরি-প্রার্থীদের এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নেবার জন্যে।

ঠিক তিন মিনিট পর পর এক-একজনের ডাক পড়ে। সামনে-বসা সেনের এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কাছে এক-একজন আড়াই শ করে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নেয় আর সেন সাহেব নিজ হাতে তাদের নিয়োগ-পত্র দিয়ে বলে দেন যে, সেদিন থেকেই তাদের চাকরি পাকা এবং মাইনেও তারা পাবে সেদিন থেকেই। আর বেলা ৩টার পর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দাশগুপ্ত সকলকে কাজ বুঝিয়ে দেবে এ-কথাও বলে দেওয়া হয় তাদের।

নিয়োগ-পত্র বিলির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জন তিন-চার আর বাকি। বছর বিশ-একুশের এক যুবকের ডাক পড়েছে সাহেবের ঘরে। যুবকের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা—কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়া যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। সাহেবের ঘরে ঢুকেই যুবকটি অত্যন্ত করুণভাবে জানায় তার অক্ষমতা—এই অল্প সময়ের মধ্যে সিকিউ-রিটির পুরো আড়াই শ টাকা সংগ্রহ করতে না পারার কথা।

সাহেব সহানুভূতি জানান ছেলেটির কথা শুনে। কিন্তু এ-কথাও তাকে বলে দেন যে, এক জনের বেলায় তো আর নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে না। তাহলে যে আর সবাইর কাছে তাঁকে অপরাধী হতে হবে। তবে কাজ পেয়েও ছেলেটি একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে তাই বা কেমন কথা। তাই সেন সাহেব এই ভরসা দেন তাকে যে,

বাকি দেড়শ টাকা না হয় তাঁর পকেট থেকেই ধার হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে টাকাটা তাঁকে শোধ করে দিলেই চলবে।

খুশিতে রাঙা হয়ে ওঠে তরুণ চাকরি-প্রার্থীর মুখখানা। তাতেই রাজী হয়ে যায় সে। সেন সাহেবের হাত থেকে নিয়োগ-পত্র নিয়ে এবং তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে ঘিরে ধরে সকলে। সে জমার টাকা পুরোপুরি যোগাড় করে আনতে পারেনি, এ-কথাটা অনেকেই এরই মধ্যে জেনে ফেলেছিল কি না, তাই তাদের ধারণা হয়েছিল যে, এ ছেলেটির কাজ কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু তারা যখন সব কথা শুনলো তার কাছ থেকে, সবাই অবাক্ হয়ে গেল সেন সাহেবের সহৃদয়তায়। তারা ধন্যবাদ জানাতে লাগলো তাদের নিজ নিজ অদৃষ্টকে এমন লোকের অধীনে চাকরি হয়েছে বলে।

দেখতে দেখতে বেলা তিনটে বেজে যায়। নিয়োগ-পত্র বিলির কাজও প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে আসে। বড়ো হল-ঘরটায় অফিস করা হয়েছে নতুন চাকুরেদের। তারা সবাই সেখানেই বসেছে। এ চাকরির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। মনিব যতোই ভালো হোক না কেন, ভালো কাজ দেখাতে না পারলে যে জীবনে উন্নতি সম্ভব হতে পারে না সে কথা তাদের মধ্যেই একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এক তরুণ আবার বলে ওঠে, "যে যাই বলুন, আমাদের ভালো-মন্দ বিবেচনা করার জন্যে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজেদের একটা ইউনিয়ন থাকা দরকার। প্রভু ভালো বলেই যে আমাদের স্বার্থে কখনো ঘা লাগতে পারবে না, এমন মনে করা ঠিক নয়। আর সব কিছুই তো সেন সাহেবের ওপর নির্ভর করবে না। মিউনিসি-প্যালিটির কর্তৃপক্ষ যেমন নিয়ম বেঁধে দেবেন তেমন ভাবেই তো

তাঁকে চলতে হবে। কাজেই আমাদের ভালো-মন্দ দেখার ভার কতকটা আমাদেরই নিতে হবে। অন্য লোক আমাদের ভালো করে দেবে, তেমন আশা না করাই উচিত। তাছাড়া আজকের দিনে একতা ছাড়া এগুনো সম্ভবও নয়।"

এ কথাগুলো সবারই খুব মনে লাগে। এ নিয়ে একটা আলোচনার আবহাওয়াও তৈরি হয়ে যায় যেন। একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা আর একজন বলতে শুরু করেছে ঠিক এমনি সময় হল-ঘরে সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এসে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব আলোচনাও স্তব্ধ হয়ে যায়।

এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট একটা টাইপ-করা তালিকা এনে পেশ করে নতুন কর্মচারীদের সামনে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদি সব ঠিক আছে কি না তার তদারক করার জন্যে তিন জনের এক-একটি দল তৈরি করে দিয়েছেন সেন সাহেব। কে কোন্ দলে পড়েছে এবং কোন্ দলের কাজ পড়েছে কোন্ এলাকায় তা টুকে নিতে হবে সকলকে। কয়েকজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে অফিসে। বাকি সকলকেই অফিসে হাজিরা দিয়ে আউটডোর ডিউটিতে বেরুতে হবে।

সবাই যে যার কাজ বুঝে নিয়ে বিদায় নেয় সেদিনের মতো।

পরদিন থেকে রীতিমতো কাজ শুরু হয়ে যায়। ছুটির আগে সেন সাহেব নিজে সকলের কাছ থেকে কাজের হিসেব বুঝে নেন। কাজের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় মালমশলা কর্মচারীদের হাতে দিতে সাহেব যেমন কোনরকম কার্পণ্য করেন না, তেমনি আবার প্রত্যেকের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝে না নিয়েও কাউকে তিনি ছাড়েন না।

তিন-চার দিনের মধ্যেই শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই মধ্যে শহরবাসীরা বলাবলি শুরু

করে দেয় যে, আলোর সমস্যা তো মিটলো, এখন যদি মিউনিসিপ্যালিটি শহরের পরিচ্ছন্নতার দিকে এবং রাস্তার উন্নতির দিকে একটু বিশেষ নজর দেয়, তাহলেই শহরের রূপ পাল্টে যেতে পারে।

পয়লা মার্চ। মাইনের তারিখ। এক-এক জন করে ডেকে ডেকে সেন সাহেবের সামনে বসেই তাঁর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট চারদিনের মাইনে পনের টাকা দশ আনা করে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সবাই সই করে টাকা নিয়ে খুশি মনে যার যার কাজে চলে যায়। সত্যিই তো, খুশি হবারই কথা। মাত্র চারদিন কাজ করার পরই কড়ায় গণ্ডায় মাইনে বুঝে পাওয়া, মন তো আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠবেই।

হঠাৎ কি একটা জরুরী ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যেতে হবে কোলকাতায়। সারা অফিসসুদ্ধ হৈ-চৈ। অথচ মাত্র তিন-চার দিনের ব্যাপার। কোলকাতা থেকে পরের রোববারই সাহেব এবার একেবারে সপরিবারে ফিরে আসবেন, এ একদম পাকা কথা। দাশগুপ্তকেও তাই বলা হয়েছে, বাড়ির ঠাকুর-চাকরকেও সেই ভাবেই তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগের দিন বিকেলে সেন সাহেবের জন্যে দাশগুপ্ত একটা রিটার্ন এয়ার প্যাসেজ বুক করে এসেছে ৯৫৲ টাকায়। বিমানে ঢাকা থেকে কোলকাতা রিটার্ন টিকিটে ৫৲ টাকা কম পড়ে। এ বাজারে পাঁচটা টাকাই বা কোথা থেকে আসে, সাহেব এ-কথা গুরুগম্ভীর ভাবে বলেছিলেন তাঁর সহকারীকে। সে-কথাও আগের দিনই রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে অফিসময়।

পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট সেরেই সেন সাহেব বিমানে কোলকাতা রওনা হয়ে যান। বিমান-ঘাঁটিতেও তিনি ভুল করেন না

এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে সব ফাইলপত্র ঠিক করে রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

সেন সাহেব না থাকলেও পুরোদমেই তাঁর অফিস চলছে। রোববার সাহেব সপরিবারে ফিরবেন কোলকাতা থেকে, তার জন্যেও কি কম তোড়জোড়! সকাল সাড়ে সাতটায় প্লেন আসবে। আধ ঘণ্টা আগে থেকেই দাশগুপ্ত বেচারা বিমান-ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির। একটা ট্যাক্সিকেও সে বলে রেখেছে যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয় তার সাহেবকে।

কিন্তু সাহেব কোথায়? প্লেন যথাসময়েই এলো। যাত্রীরা একে একে নেমে যে যার গন্তব্যস্থলে চলেও গেল। সাহেবের কোন হদিসই নেই। এ কেমন কথা!—বিস্মিত হয়ে ভাবে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট।

হয়তো কোন অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকবে। দু-এক দিনের মধ্যেই যাই হোক একটা চিঠি পাওয়া যাবে নিশ্চয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে দাশগুপ্তও চলে যায় বিমান-ঘাঁটি ছেড়ে। সাহেবের বাড়িতে গিয়ে খবরটা জানিয়ে যেতেও ভুল করে না সে। ততোক্ষণে চাকর মনুয়া বড়ো হাতে বাজার করে নিয়ে এসেছে। সাহেবই রোববারের বাজারের জন্যে দশটা টাকা পৃথক করে দিয়ে গিয়েছিলেন তার হাতে। কিন্তু এ যে দেখছি সবই মাটি হলো! সকাল বেলার খাবারের আয়োজনটাও বৃথা! তার ভোগে অবশ্য লাগলো খানিকটা। তবু সাহেব না আসায় নিরাশ হয়েই আপন মনে বাড়ি ফিরে যেতে হয় তাকে।

দিনের পর দিন কাটে। অফিসও চলেছে সেন সাহেবের। কিন্তু মাস শেষ হতে চললো, সাহেবের যে কোন খোঁজ-খবরই নেই! তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটলো, না আর কিছু?

অফিসের লোকদের মনে একটু একটু সন্দেহও দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। তবু তারা বিনা দ্বিধায় কাজ করেই চলেছে, যদিও সে কাজ ক্রমশই যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে।

সন্দেহ আরও গভীর হয়ে উঠছে। সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দাশগুপ্তও অত্যন্ত বিচলিত। পরদিনই তো আবার মাস-পয়লা। কর্মচারীদের মাইনের তাগিদ সামলাবে কি করে? মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও তো এ পর্যন্ত কোন খোঁজ-খবর এলো না! এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে সব কিছুই কেমন যেন ধোঁয়াটে বলে মনে হতে লাগলো তার।

এমন সময় হঠাৎ দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত সেন সাহেবের অফিসে। তাঁরা জানালেন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাঁরা এসেছেন একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্যে।

অফিসের কর্মচারীরা সেন সাহেবের ঘর দেখিয়ে দেয় ভদ্রলোক-দের। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসেছেন, এ-কথা শুনে সবারই যেন প্রাণে জল আসে। যাক, বাঁচা গেল! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সবাই।

এদিকে ভদ্রলোক দুজন হঠাৎ সাহেবের ঘরে ঢুকতেই হকচকিয়ে ওঠে দাশগুপ্ত।

কাকে চাই?

আমরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আসছি। কয়েকটি বিষয় জানবার আছে আমাদের। কাকে জিগ্যেস করবো বলুন তো?

কি আপনাদের জিজ্ঞাস্য তা না জানলে তো ঠিক বলতে পারছি না, আমি আপনাদের কথার উত্তর দিতে পারব কি না।

এ অফিসের কর্তা কে? তাঁর সঙ্গেই আমরা একটু কথা বলতে চাই।

তিনি তো বাইরে গেছেন কয়েক দিনের জন্যে। কবে ফিরবেন তাও আমাদের কারুর জানা নেই।

আচ্ছা, আপনাকেই তাহলে জিগ্যেস করি। কিছুদিন ধরে শহরের সব রাস্তার আলোগুলোর পাওয়ার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে পর পর অনেকগুলো চিঠি আসে এ কাজের জন্যে প্রশংসা জানিয়ে। অথচ রাস্তার আলো বা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটি ইদানীং এমন কিছু করেনি যার ফলে এ ধরনের প্রশংসা তারা পেতে পারে। তাই বিষয়টির তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের ওপর এবং খোঁজ-খবর করে জানা গেল যে, এই অফিস থেকেই নাকি মাসাধিক কাল ধরে শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করা হচ্ছে। কি ব্যাপার বলুন তো!

হ্যাঁ, আমাদের এ অফিস থেকেই তো এ কাজ করা হচ্ছে। কেন, আপনারা মিউনিসিপ্যালিটির লোক, এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? আমাকে তো সাহেব বলেছিলেন যে, শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার তাঁর ওপরে। আর দশটা ফার্মের মতো মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গেও তাঁর নাকি একটা কনট্রাক্ট রয়েছে।

এ কি কথা বলছেন, মশাই? এ যে একেবারে অবাক্ করলেন দেখছি?

কেন বলুন তো?

কেন আবার কি, মিউনিসিপ্যালিটির নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট থাকতে তার কী দরকার হতে পারে বাইরের কোন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কন্ট্রাক্টে আসার? আর দরকার বোধ করলে কী এতো বড়ো মিউনিসিপ্যালিটি দু-চারজন নতুন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

করে নিতে পারে না? আচ্ছা, আপনি এখানে কি করেন এবং কতো দিন ধরে এখানে কাজ করছেন?

আমি সেন সাহেবের পার্সন্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। অন্তত খাতা-পত্রে তো আমার তাই ডেজিগনেশ্যান, আর অফিসের সবাইও তাই জানে। তবে চাকরি আমার এখানে মাত্র এক মাস ছ-দিনের।

তাই নাকি? এ কোম্পানীর বয়স কতো বলতে পারেন?

আমার ধারণা, আমিই এখানকার সব চেয়ে পুরানো কর্মচারী। কোলকাতায় নাকি এ কোম্পানীর হেড-অফিস। ছোট ভাইকে কোলকাতা অফিসের পুরো চার্জ বুঝিয়ে দেবার জন্যেই তিনি কোলকাতা যাচ্ছেন, আমাদের তো সেন সাহেব এ কথাই বলে গেলেন। যাবার সময় তিনি আরো বলেছেন যে, কোলকাতা অফিসের জন্যে এখন আর ওঁর কোন ভাবনাই নেই; ঢাকা অফিসটা ভাল করে অর্গ্যানাইজ করাই এখন বড়ো কাজ, তাই এবার একেবারে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবেন ঢাকায়।

আচ্ছা মশাই, এই এক মাস ছ-দিনের চাকরিতে সেন সাহেবকে কি রকম লোক বলে মনে হয়েছে আপনার?

সত্যি কথা বলতে কি, এর আগে আমি আরো দু-তিনটে দেশী ফার্মে কাজ করেছি, কিন্তু কোন অফিস-বসকেই এমন ঘড়ি ধরে এবং এমন নিখুঁত ভাবে কাজ করতে দেখিনি। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে ভদ্রলোকের সহৃদয়তার পরিচয়ও তো যথেষ্টই পেয়েছি। যে ক'টা দিন ওঁর সামনে বসে কাজ করেছি তার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি ওঁর কর্মব্যস্ততা। বাস্তবিকই খুব ঘন ঘন টেলিফোন এসেছে ওঁর কাছে—কখনো মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, কখনো কখনো বা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন বড়ো বড়ো ফার্ম থেকে। অবিশ্যি কোথা থেকে কোন্ টেলিফোন এসেছে সাহেব যা বলেছেন আমি

তাই বিশ্বাস করেছি। অবিশ্বাস করার কোন কারণও তো কখনো ঘটেনি। তাছাড়া, সাহেব কোলকাতা চলে যাবার পরেও মাঝে মাঝে ফোন এসেছে, আমিই সে সব ফোন ধরেছি। প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছি তাতেও কখনো কোন রকম সন্দেহ হয়নি। 'কে বলছেন?'— এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ জানিয়েছেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, কেউ বা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে, নয়তো বা নারায়ণগঞ্জের রেলী ব্রাদার্স কোম্পানী থেকে, সেন সাহেবকে চাই। সাহেব কোলকাতা গেছেন এ কথা শোনার পরে আর কারো সঙ্গেই বেশি কথা হয়নি।

কিন্তু মশাই, সব ব্যাপারটাই যে সাজানো আর ভুয়ো তা কী এখনো আপনাদের মনে হচ্ছে না? এ কথাটা জেনে রাখুন, মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে আপনাদের সেন সাহেবের কোন সম্পর্কই নেই। আর এও আমি বলতে পারি যে, যারা আপনাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম করে ফোন করতো তারা সেন সাহেবের ভাড়াটে ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে কি বলছেন মশাই? তাহলে যে আমাদের সর্বনাশ!— এই বলেই সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কর্মচারীদের কয়েক জনকে ডেকে আনেন সাহেবের অফিস-ঘরে। সমস্ত কথা শুনে তারাও হতবাক্ হয়ে যায়, ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি দল তাদের একটু শান্ত হতে বলে বাড়িওয়ালাকে সেখানে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করেন।

কাছেই বাড়িওয়ালার বাড়ি। বেশ নামকরা লোক। অনেক-গুলো ব্যবসায়ের মালিক। তার ওপর আট-দশখানা বাড়ি থেকেও ভদ্রলোকের প্রচুর আয়। কিন্তু বিদ্যাস্থান নিতান্তই দুর্বল হওয়ায় বেচারা সবাইকেই খুব সমীহ করে চলেন। বিশেষ করে সরকারি অফিস-কাছারির লোক দেখলে তো কথাই নেই! কে জানে, কে

আবার কোন্ দিক দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলে দেয়, এই ভয়। বাড়ির দরজায় মিউনিসিপ্যালিটির তকমা-আঁটা পিয়নের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই বাইরের বিশ্রাম-ঘর থেকে একেবারে ছুটে আসেন দাস মশাই।

নমস্কার হুজুর! মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার খগেনবাবু আর ধীরেশবাবু সেন সাহেবের অফিস-ঘরে অপেক্ষা করছেন। আপনাকে এখুনি যেতে হবে সেখানে।

দুজন কমিশনার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন! দাস মশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠেন এ কথা শুনে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কোন রকমে একটা জামা গায়ে চড়িয়ে দাস বেরিয়ে আসেন এবং পিয়নের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সেন সাহেবের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন।

এই যে দাস মশাই, খুব জাঁদরেল ভাড়াটে যোগাড় করেছিলেন দেখছি। ক-মাসের ভাড়া বাকি, তাই আগে বলুন দেখি শুনি!

সে আবার কি কথা বলছেন স্যার! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।—দাস হকচকিয়ে ওঠেন কমিশনারদের কথা শুনে।

বুঝতে পারছেন না? আপনার ভাড়াটে সেন সাহেব তো উধাও। ভাড়া-টাড়া কিছু পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভদ্রলোক তো দু-মাসের ছ-শ টাকা ভাড়া আগাম দিয়েই বাড়িতে ঢুকেছেন। তা আপনারা যাই বলুন না কেন, সেন সাহেব সত্যি সত্যি খাঁটি ভদ্রলোক। এই তো সেদিন পরিবার নিয়ে আসার জন্যে কোলকাতা গেলেন। যাবার সময় দেখা করে যেতে ভুল করেননি। শুধু তাই নয়, কোলকাতা থেকে আমাদের কিছু নিয়ে আসার দরকার আছে কি না তা পর্যন্ত বার বার জিগ্যেস করে গেছেন। বলুন তো, কোন্ ভাড়াটে করে এ রকম?

না, কখখনো না। তবে ব্যাপার কি জানেন দাস মশাই,

আপনি যতোই ভীমনাগের সন্দেশ বা বাগবাজারের রসগোল্লার অর্ডার দিন না কেন, সেন সাহেব কোন দিনই সে সব নিয়ে আপনার কাছে আর ফিরে আসবেন না।

না আসলেও আমার কোন ক্ষতি নেই তাতে। এ মাস অবধি তাঁর ভাড়া তো পরিষ্কারই আছে। দুদিন দেখে নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দেবো।

সেন ভারি আশ্চর্য লোক তো দেখছি তাহলে!—একজন কমিশনার বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই বলে।

আচ্ছা মশাই, এ ঘরে ও ঘরে বারান্দায় এতো যে সব ফার্নিচার দেখছি, এ-সব এলো কোত্থেকে?—সেন সাহেবের এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে জিগ্যেস করেন আর এক কমিশনার।

এ-সবও তো ভাড়ারই ব্যাপার। মাসিক ভাড়া আড়াই শ টাকা করে। দু-মাসের ভাড়া এর জন্যেও আগাম দেওয়া আছে, এই দেখুন।—এই বলে দাশগুপ্ত হিসেব-পত্রের একখানা বড়ো খাতা খুলে ধরে ঐ কমিশনারের সামনে।

বেশ দিলদরিয়া লোকই তো দেখছি আপনাদের সেন সাহেব। হাজার দেড়হাজার টাকার রিস্ক্ নেওয়া সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। খুব শাঁসালো ফ্যামিলিরই ছেলে হবে সেন।

সবই বুদ্ধির খেলা স্যার! দেড়হাজার খরচ করে যদি দশহাজার টাকা হাতে আসবে বুঝতে পারা যায় তাহলে দেড় হাজারের রিস্ক্ নেবে সে আর বেশি কি? এই দেড়হাজার টাকাও সেন হয়তো দেড় শ টাকা রিস্ক্ নিয়েই রোজগার করেছে। এই ধরুন না আমারই কথা। গরীবের ছেলে বৌ-এর গয়না বিক্রি করে পাঁচ শ টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেম, আর আজ তো দশখানা বাড়ির মালিক এই ঢাকা শহরে!—কথায় কথায় কমিশনারদের কাছে নিজের কৃতিত্বের বড়াই

করতে গিয়ে কালোবাজারে প্রচুর অর্থলাভের কথা স্বীকার করতে একটুও বাধে না সোজা মানুষ বাড়িওয়ালা দাস মশাইয়ের।

কিন্তু তা নয় হলো। হাজার দেড়েক টাকা খরচ করে সেনের কি লাভ হলো, তাই তো বুঝে উঠতে পারছি না আমরা!

কেন স্যার, মোট এক শ দুজন কর্মচারীকে নিয়োগ-পত্র দেবার সময় সেন সাহেব আড়াই শ করে টাকা সিকিউরিটি নিয়েছেন প্রত্যেকের কাছ থেকে। শুধু মাত্র একজনের কাছ থেকে পেয়েছেন একশ টাকা। অবশ্য প্রথম মাসের শেষ কয় দিনের জন্যে কর্মচারীদের মাইনে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ হাজার দুই টাকা হয়তো খরচ হয়ে থাকবে, আর বাকি বাইশ-তেইশ হাজার টাকাই তো নেট লাভ!—এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের হিসেব শুনে আঁৎকে উঠেন সবাই একসঙ্গে।

এর পর আর আলোচনা নিরর্থক। সবাই তাই উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে। সেদিনই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে শহরের চারদিকে।

পুলিশকেও স্তম্ভিত করে এই অভিনব বিরাট প্রতারণা। মিউনিসি-প্যালিটি এবং প্রতারিত কর্মচারীদের তরফ থেকে থানায় যে ডায়েরী করা হয়েছে তাকে ভিত্তি করে সারা দেশময় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায় নন্দ সেনের। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

তার পর কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক খুনোখুনির তাণ্ডব। হলো দেশবিভাগ।

এর পরেও নন্দ সেনের নিশ্চিন্ত না হবার কি কারণ থাকতে পারে? দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে তার আরো কত অস্থায়ী কোম্পানী চালু হয়েছে কে জানে? এতদিনে এদেশে বেনামীতে একজন গণ্যমান্য নেতা হয়ে বসাও নন্দ সেনের পক্ষে খুব বেশি কিছুই নয়।

বায়না

ছোট করে হলেও খবরটা ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে।

অনেকের চোখেই পড়েছিল সে খবর। শহরের এদিকে ওদিকে এ নিয়ে যে রীতিমতো বলাবলি হয়েছে তাও অনেকের মনে থাকার কথা।

তবু ঘটনাটা আর একবার নতুন করে আলোচনা করার মতো।

কেসি সাহেব তখন বাঙলার গভর্ণর। বাঙলা দেশ অবিভক্ত ছিল সে সময়। তখন একবার এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন মিঃ নোল্যাণ্ড। বেশ লম্বা চওড়া মানুষটি। কথাবার্তা বেশ মিষ্টি।

কেসি সাহেবেরই দেশের লোক মিঃ নোল্যাণ্ড। তাঁরই নাকি সহপাঠী। অষ্ট্রেলিয়ার কোন্ একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পার্টনার।

ছোটবেলার সহপাঠী বাঙলা দেশের গভর্ণর। সেই সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষ দেশটা ঘুরে আসার শখ হলো নোল্যাণ্ডের। তবে সেবার ভারত সফরে এসে মাত্র দুদিন ছিলেন তিনি কোলকাতায়।

কিন্তু এতো অল্প সময়ে কোলকাতা শহরের কতোটুকুই বা দেখা সম্ভব? মাত্র দুদিন ঘুরে এতো বড়ো মহানগরী সম্বন্ধে কোন রকম ধারণাই যে করা চলে না, এ কিন্তু নোল্যাণ্ড সাহেব বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন। কিন্তু কী আর করবেন, আর বেশি দিন থাকার কোন উপায়ই ছিল না। ব্যবসার ব্যাপারেই অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা জরুরী ফোন পেয়ে হঠাৎ ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

যাক আর একবার আসা যাবে। অখুশি মনকে এইভাবে তখন বুঝ দিয়েছিলেন নোল্যাণ্ড। কিন্তু এই আর একবার আসাকে সম্ভব করে তুলতে বেশ কয়েক বছর কেটে যায় নোল্যাণ্ডের।

সাত বছর পর অনেক চেষ্টা করে তিনি যখন আবার এলেন ভারত সফরে এদেশ তখন স্বাধীন। ভারত দ্বিধাবিভক্ত। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশও।

বাঙলার গ্রামাঞ্চল দেখার শখ ছিল নোল্যাণ্ডের। বিশেষ করে পূর্ব-বাঙলার নদীনালাময় পল্লী এলাকা। কিন্তু নানা রকম কথা শুনে সে প্রোগ্রাম একদম বাতিলই করে দিয়েছেন তিনি।

কোলকাতা, দিল্লী, বোম্বে আর মাদ্রাজ। ব্যস, এ চারটি শহর ভালো করে দেখলেই ভারতবর্ষের নগরজীবনের মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে, নোল্যাণ্ড সাহেবের এই ধারণা। তাই নতুন প্রোগ্রাম তিনি স্থির করেছেন এইভাবে।

চৌরংগির একটা নামকরা হোটেলে আছেন নোল্যাণ্ড।

কোলকাতার প্রোগ্রাম সাত দিনের। সাতদিনের মধ্যে পাঁচদিনই ঘুরে কাটিয়েছেন তিনি কোলকাতার আশেপাশে। বাটানগরে যেয়ে বাটার জুতোর কারখানা দেখেছেন। বিড়লাপুরে দেখেছেন বিড়লা জুট মিল। টিটাগড়ে কাগজের কল। এমনি সব। অবশ্যি এরই মধ্যে নাচগানের আসরেও যোগ দিয়েছেন। এদেশী এবং বিদেশী ছবিও দেখেছেন কয়েকখানা।

নোল্যাণ্ড কর্মীলোক। সত্যিকারের কর্মী যাঁরা তাঁদের সময়ের অভাব হয় না। অল্প সময়ের মধ্য থেকেই তাঁরা সময় বার করে নেন বিশেষ বিশেষ জরুরী কাজ সেরে নেবার জন্যে।

কিন্তু তা হলেও সময় আছে হাতে মাত্র আর এক দিন। এই এক দিনের মধ্যেই বাকি সব কিছু দেখে নিতে হবে। আগের দুদিনে শহরের কয়েকটা বড়ো জিনিসই দেখে নেওয়া হয়েছিলে। কাজেই সেগুলোকে নতুন করে আর দেখতে হবে না। কালীঘাটের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আলিপুরের চিড়িয়াখানা এসবই গতবারের

বাপ রে, একেবারেই যে নাছোড়বান্দা দেখছি ! আচ্ছা, এক গেলাস জল দিন তো মা !

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে একটা আস্ত রসগোল্লাই মুখগহ্বরে ছুঁড়ে দেন ক্যাপ্টেন ঘোষ।

করুণাবাবুর ছোট্ট ছেলেটি এমনি সময় সে-ঘরে ছুটে আসতেই ক্যাপ্টেন খপ্‌ করে তাকে ধরে ফেলেন বাঁ-হাতে।

তোমার নাম কি খোকা ?

পান্তু !—মাত্র পাঁচ বছর বয়স হলেও মোটেই ঘাবড়াবার পাত্র নয় সে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে নির্বিকার-চিত্তে কথাবার্তা বলায় সে অভ্যস্ত। ভয়-ডরের লেশমাত্রও নেই।

একটা মিষ্টি তুলে পান্তুর হাতে দিতেই সে-ও সেটা মুখে পুরে দিতে মুহূর্ত বিলম্ব করে না। মা জল আনতে গিয়েছেন। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বেন, সে আশঙ্কাটা তো আছে মনে।

ক্যাপ্টেন ঘোষকে রুমালে হাত এবং মুখ মুছতে দেখে পান্তু বিস্মিত হয়ে যায় যেন !

ঐ যে, আরও রইলো যে, খেলেন না ?

তুমি খাবে ?

না, মা বকবে !

না, বকবে না, এ সন্দেশটা তুলে নাও টুক্‌ করে—পান্তুকে এ কথা বলেই ক্যাপ্টেন ঘোষ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রান্নাঘরের দিকে।

এদিকে সীমাও উনুনে একবার তরকারিটা নাড়া দিয়ে জলের গেলাস নিয়ে বেরিয়েছেন। রান্নাঘরের দোরমুখেই ক্যাপ্টেন ঘোষ সীমার হাত থেকে জলের গেলাস নিয়ে যেই খেতে যাবেন, অমনি সামনের দরজা খুলে এসে দাঁড়িয়েছে সুখেন্দু।

আরে কে, এই ভাগ্নে না? আর জুতো খুলে ঘরে ঢোকবার সময় নেই। আগে চাকরিটা হ'য়ে যাক। পরে এসে একেবারে মিষ্টি হাতে নিয়ে মামিমার সঙ্গে দেখা করলেই চলবে।—এই বলে জলে চুমুক দিয়ে বা না দিয়েই গেলাসটা নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে পড়েন ক্যাপ্টেন। তারপর দরজা থেকেই সুখেন্দুকে ঝাপটে ধরে নিয়ে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান দুজনে।

সুখেন্দু, এই ক্যাপ্টেন ঘোষই তোমার জন্যে এতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। ইন্টারভ্যুর খবরটা দিয়ে যেয়ো কিন্তু।—পেছন থেকে শুধু এইটুকু বলেই সীমা সুখেন্দুকে বিদায় দেয়। কিন্তু তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে না পেরে তার মনটা ভারি খারাপ লাগে।

সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছুটে রাস্তার দিকের গাড়ি-বারান্দায় যেতেই সীমা দেখতে পায়, সুখেন্দু ট্যাক্সির ভেতর থেকে মুখ বের করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ট্যাক্সিটা 'ফুস' করে ছেড়ে দেয়।

বেলা তখন প্রায় তিনটা।

খেয়ে-দেয়ে সীমা একটু বিশ্রাম করছিলো। শুয়ে শুয়ে একখানা উপন্যাস পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা তার নিজেরই খেয়াল নেই! বড়ো ছেলে দুটো ইস্কুলে, ছোট ছেলেটাও দুরন্তপনায় ক্লান্ত হয়ে তারই পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কে, কে?—ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন দরজায় বার বার 'নক' করছে শুনতে পায় সীমা। ঘুম থেকে উঠে বসে।

ভানু দেখ তো কে ডাকছে?

ভানুও ঘুমিয়েই পড়েছিল। সীমার ডাক শুনে উঠে দরজা খুলে দিতেই সুখেন্দু এসে ঘরে ঢোকে।

মামিমা কোথায় ?—জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে ভানুকে জিগ্যেস করে সুখেন্দু।

শোবার ঘরেই আছেন। ঘুম থেকে বোধ হয় উঠলেন এইমাত্র।

খুব সুখবর দিয়েছিলে মামিমা! আচ্ছা, ক্যাপ্টেন ঘোষ কি তোমাদের অনেক দিনের জানা-শুনো ?

সুখেন্দু শোবার ঘরে ঢুকতেই সীমা তার মুখে একটা কালিমার ছাপ লক্ষ্য করছিল। তার প্রশ্ন সীমাকে তাই আরও যেন চিন্তিত করে তোলে।

কি ব্যাপার, বলো তো ?

ব্যাপার পরে শুনবে, মামিমা! আগে বলো, ভদ্রলোককে তুমি আগে থেকেই জানতে কি না।

না, আমি তো কোন দিনই এঁকে আগে দেখিনি ? তবে আজ সকালবেলা টেলিফোন করে তোমার মামার সম্বন্ধে ভদ্রলোক এমন সব কথা বললেন, যাতে ওঁদের পরিচয়টা অনেক দিনের বলেই তো মনে হলো।

তা হলেই হয়েছে। লোকটা এক নম্বরের 'চিট্'।

সে কি!—সীমা আঁতকে ওঠে সুখেন্দুর কথা শুনে। ছাড়া-চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে জিগ্যেস করে—

তুমি কোথা থেকে এলে এখন ?

আর বলো না। তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়িতে ফিরে নাকে-মুখে কিছু গুঁজেই ছুটে এলাম তোমার কাছে। ভয় হচ্ছিল, আবার লোকটা এসে তোমার ঘাড়ে চাপলো কি না। তা ছাড়া খোঁজ নেয়া দরকার মনে হলো যে, সত্যিই লোকটা তোমাদের আগে থেকেই পরিচিত কি না। তখন তো তোমার সঙ্গে একটা কথা বলারও সুযোগ পাইনি।

হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম তখন। আমারও ভারি খারাপ লাগছিল, লোকটা যখন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলতে না দিয়ে তোমায় টেনে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা কি হয়েছে, এবার বল শুনি।

ব্যাপার আর কি! অল্পের ওপর দিয়েই বেঁচে গেছি, এই রক্ষে! এক শ টাকা মুক্তি-পণ দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছি। রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে যে ভাবে সে আলাপ করছিল, তারপর তোমার সামনেই সে আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বললো, তাতে লোকটার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসও আমার মনে শেষ পর্যন্ত উঁকি দিতে পারেনি। কাজেই সে আমাকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারতো, আর যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো।

সীমা শিউরে ওঠে সুখেন্দুর এ কথা শুনে।

তুমি শিউরে উঠছো মামিমা! একটা অপরিচিত লোক প্রথমে টেলিফোনে আলাপ-পরিচয় জমিয়ে, তার পরে ঘরে এসে গভীর অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়ে এমনি নিখুঁত অভিনয় যে করতে পারে, তার পক্ষে কোন কিছুই কি করা অসম্ভব?

সুখেন্দু যতোই বলে, সীমার চোখ দুটো ভয়ে-বিস্ময়ে যেন ততোই বড়ো হয়ে ওঠে।

ট্যাক্সি চড়ে ক্যাপ্টেন ঘোষের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম তো তোমাদের এখান থেকে। গাড়ি ছাড়তেই মামার যে কী প্রশংসা ক্যাপ্টেনের মুখে সে আর কি বলবো! দিল্লী থেকে প্রায় প্রতি মাসেই নাকি তাকে দু-একদিনের জন্যে কোলকাতায় আসতে হয়; আর মামার সঙ্গে দেখা না করে কোন বারেই নাকি লোকটা দিল্লী ফেরে না—মামার প্রতি এমনি তার টান! যাক, ট্যাক্সি শ্যামবাজার পৌঁছুতেই ড্রাইভার বলে বসলো, সে আর যাবে

না। ক্যাপ্টেন একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে বুক-পকেট থেকে ছুটি টাকা বের করে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড থেকে আরো বেশি জমকালো একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে জেঁকে বসলো। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে গাড়ি চলতে শুরু করলো এসপ্লানেডের দিকে।

তার পর?

তারপর নতুন গাড়িতে উঠেই ক্যাপ্টেনের প্রথম কথা, বড্ড দেরি হয়ে গেল। কিন্তু তা হলেও ইণ্টারভ্যুর আগেই আসল কর্তাকে একটা 'প্রেজেন্ট' দিয়ে হাত করে নিতে হবে। শ পাঁচেক টাকার কমে ওর মতো লোককে কোন প্রেজেণ্টেশন দেয়া চলে না, বুঝলে ভায়া? তবে আমার কাছে শ দেড়েক টাকার মতো আছে। তুমি যদি আর কিছু টাকা দিতে পার, তা হলে কতক টাকা বাকি রেখে আমার চেনা একটা দোকান থেকেই প্রেজেণ্টেশনটা নিয়ে আসতে পারি। ক্যাপ্টেনের এ কথায় প্রথমটায় আমি একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। তবু কেন জানি, 'সম্ভব নয়' বলতে ভরসা হলো না। চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে! দেখাই যাক বাড়ি গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে পরামর্শ করে। এই ভেবে 'টাকার জন্যে একবার ঢাকুরিয়া যাওয়া দরকার' এ-কথা বললাম ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন আবার সময়ের অজুহাত তুলে প্রথমটায় কেমন যেন একটু বিরূপ ভাব দেখালো। তারপর একটু বিরক্তির সঙ্গে 'কি আর হবে; চালাও জোরসে, ঢাকুরিয়া যানে হোগা'—হুকুম করলে ড্রাইভারকে।

তার পর?

তার পর আর কি, গাড়ি সেণ্ট্রাল এভেন্যু ধরে এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোড হয়ে ঢাকুরিয়ার দিকে বেগে

এগিয়ে চলেছে। পথে ক্যাপ্টেনের মুখে কতো রকমের যে আশ্বাস, কতো উপদেশ—সে সব বলে লাভ নেই। আর মামার প্রশংসা তো কথায় কথায়! মামা নাকি দিল্লীতে গিয়ে কয়েক বছর আগে তাদের বাসাতেই উঠেছিলেন। সেবার ক্যাপ্টেনের বাবা-মা নাকি মামাকে এতো আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন যে, সে-কথা মামা প্রতিবারেই নাকি ক্যাপ্টেনকে শুনিয়ে থাকেন।

সে কি! সেবার তো আমরা সবাই মিলে দিল্লী গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় এবং সে ভদ্রলোক তোমার মামারই এক কলেজের বন্ধু।

তা হলে বুঝতেই পারছো, এবার ক্যাপ্টেন ঘোষ লোকটি কি চিজ! তার পরে প্রতিবারেই নাকি কোলকাতায় এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, আর তোমার আদর-যত্নে সে একেবারে অভিভুত! সকালবেলা দোর খুলে যা' দেখলাম, তাতে তার এ সব কথায় আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়নি বরং মুহূর্তের জন্যে তোমাদের সঙ্গে যেটুকু অন্তরঙ্গতা সকালবেলা লক্ষ্য করেছি এবং যে ভাবে ক্যাপ্টেন তোমাদের সম্পর্কে নানা নতুন-পুরনো কথা তুলেছে, তাতে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করে উপায়ই বা কি?

ঐ লোকটাকে কি তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলে?

তা গিয়েছি বৈ কি! ক্যাপ্টেন শুধুমাত্র তোমার দেয়া চা-মিষ্টি খেয়েই পরিতুষ্ট হবে, সেই-বা কেমন কথা? আমাদের বাড়িতে ঢুকেই মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে 'পিসিমা' সম্বোধন! আর কি কথা আছে! একে মধুর 'পিসিমা' ডাক, তার পরে ছেলের চাকরি করে দেবে! পরিশ্রান্ত ভাইপোর ক্লান্তি দূর করার জন্যে মায়ের তখন সে কি চেষ্টা! তাড়াতাড়ি ইয়া-বড়ো এক

গেলাস ঘোলের সরবৎ এসে পড়ল! অবশ্য আমিও সেই সঙ্গে ছোট এক গেলাস সরবৎ পেয়েছিলাম। সে কথা থাক। অল্প একটু সময়ের মধ্যে তোমাদের নানা গুণগান করে মা আর বাবাকেও ক্যাপ্টেন ঘোষ সহজেই অভিভূত করে ফেললে, আর 'সময় নেই' বলে এমন তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলে যে, আমার চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করারও সুযোগ পেলাম না।

তার পর কি হলো?—সুখেন্দুর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে সীমা।

তার পরে কি আর বলবো মামিমা! অল্প কতোক্ষণ সময়ের মধ্যে ঝড়ের গতিতে যেন সব-কিছু ঘটে গেল। ক্যাপ্টেনের তাড়ায় মা আড়াই শ টাকা চেয়ে ন-মামার কাছে একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। মাসের শেষ, তাঁর হাতেও তখন আড়াই শ টাকা ছিল না। তাই তিনি এক শ টাকা দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তক্ষুণি তার বেশি দেবার আর ক্ষমতা নেই তাঁর। ভাগ্যি, তাঁর কাছে আর বেশি টাকা ছিল না; থাকলে আরো কতোগুলো টাকা নষ্ট হতো মিছামিছি।

এক শ টাকা পেয়েই বুঝি ক্যাপ্টেনকে দিয়ে দিলে? টাকাটা পেয়ে কি বললে লোকটা?

না, টাকাটা সঙ্গে সঙ্গেই দেইনি। টাকা পেয়েই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আমি বেরিয়ে আসি। আসার সময় ক্যাপ্টেন মাকে ও বাবাকে বেশ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করলে। শুধু তাই নয়, নিজের গরজেই মিষ্টি খাওয়ার একটা নেমন্তন্নও আদায় করে নিলে।

সে কি রকম?

কী রকম আবার? মাকে প্রণাম করে বেশ খোলামনেই বলে ফেললে, 'শুধু এই ঘোল খেয়েই বিদায় হচ্ছি মনে করবেন না

পিসিমা ; সুখেন্দুর কাজটার ব্যবস্থা করেই আবার ফিরে আসছি। মিষ্টি পাওনা রইল।' মা তো আনন্দে ফেটে পড়েন আর কি, বাবাও খুশিতে ভরপুর। দুজনেই সমস্বরে বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আসবে, বিকেল বেলা চা-মিষ্টির নেমন্তন্ন রইল।'

বাঃ, বেশ তো মজা !—সীমা অবাক্ হয়ে যায় কাহিনী শুনে।

মজা তো বেশ। ভাগ্যি, লেভেল ক্রশিং-এর গেটটা বন্ধ থাকায় ট্যাক্সিটা রেল-লাইনের ওপারেই ছিল। তা না হলে ড্রাইভারের হাতে নাস্তানাবুদ হতে হতো।

কেন ?

কেন, তা পরেই টের পাবে ; আগে সবটা শুনেই নাও। তবে এখন শুধু এটুকু তোমাকে বলে রাখছি যে, ড্রাইভার আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িটা চিনে রাখতে পারলে তোমার এখানে আজ আর এখন আসতেই পারতাম না।

ঠিক আছে। তার পরে কি হলো, তাই বলো।

ক্যাপ্টেনকে নিয়ে তো বেরিয়ে এলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের এপারে এসে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ছুটলাম এসপ্লানেডের দিকে। গাড়িতে বসেই এক শ টাকার নোটখানা ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে আর বেশি টাকা দেবার অক্ষমতা জানালাম। ক্যাপ্টেন প্রথমটায় কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করলে টাকাটা নিতে। একবার বললেও 'এই সামান্য টাকায় কি করেই বা কি করি !' তার পর একটু চিন্তা করে আবার বললে, 'শ আড়াই টাকা দিয়ে আর শ আড়াই বাকি রেখে এখনকার মতো প্রেজেন্টশনটা কিনে নেয়া যাক। পরে বাকি টাকাটা শোধ করে দিলেও চলবে।' এই বলে ক্যাপ্টেন টাকাটা তার বুকপকেটে তুলে নিলে।

আচ্ছা, এ টাকাটা দেবার সময়ও কি তোমার মনে কোন রকম সন্দেহ হয়নি?

আরে কি মুশকিল! সন্দেহ হবার মতো কোন অবকাশই তো ক্যাপ্টেন দেয়নি। নেহাত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টাকাটা পকেটে পুরেই ইণ্টারভ্যু সম্পর্কে আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দিতে লেগে গেল লোকটা। এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এবং তার উত্তর আমাকে বলে দিয়ে বললে যে, এটা কিন্তু কিছুতেই ভুল করলে চলবে না। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে এই প্রশ্নটি যেমনি সূক্ষ্ম, তার বলে-দেয়া উত্তরটিও ছিল তেমনি নিখুঁত। এর পরে তাকে সন্দেহ করার আর কোন উপায় থাকতে পারে, বলো?

তাতো ঠিকই। আচ্ছা, তোমরা কোন্ দোকানে গেলে প্রেজেণ্টেশন কিনতে?

শোনই না ব্যাপার। প্রেজেণ্টেশন কিনতে কি আর আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে সে? তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষ কি অতো বোকা ছেলে!

হঠাৎ পাশের ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটোর কাচ ঝন্-ঝন্ করে ভেঙে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কি হলো? শব্দ শুনে সীমা ও সুখেন্দু দুজনেই ছুটে যায় সেখানে। গিয়ে দেখে ঘরের এক কোণে অপরাধীর মতো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে পান্তু। এই তো একটু আগে ঘুম থেকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে কখন যে বল খেলা শুরু করে দিয়েছে; আর এরি মধ্যে এই কাণ্ড!

বাবা আসুক, দেখবে মজা দুষ্ট ছেলে। এই বলে সীমা ছুটে গিয়ে হিড়হিড় করে কান ধরে টেনে নিয়ে আসে পান্তুকে। সুখেন্দু মামিমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় ছেলেটাকে। নইলে দু-এক ঘা যে ছেলেটার পিঠে পড়তো তাতে সন্দেহ নেই।

যাক্ গে, ভারি তো একটা ফটোর গ্লাস ভেঙেছে। আমার তো চিন্তা হয়েছিল, তোমার কাছ থেকেও ক্যাপ্টেন ঘোষ পটিয়ে কিছু বের করে নিয়েছে কি না!

হ্যাঁ, নিলেই হলো! আমার কাছ থেকে এতোই সোজা!

না, সোজা যে নয়, তার তো খুবই পরিচয় দিয়েছ। জামাই-আদরে চা-মিষ্টি খাইয়ে ভাগ্নের জন্যে মস্ত এক মুরুব্বী যোগাড় করেছ! সে যাক্ গে। ক্যাপ্টেনের প্রেজেণ্টেশন কেনার রহস্যটাই এখন শোন। এসপ্লানেড অঞ্চলে একটা বড়ো হোটেলের সামনে আসতেই গাড়ি থামাবার হুকুম হলো। সাহেবের পেছন-পেছন আমিও নেমে এলাম। ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে সঙ্গে করে গটগট করে হোটেলের ভেতর চলে গেল। হঠাৎ গিয়ে উঠলাম ঐ হোটেলেরই একটা হেয়ার-কাটিং সেলুনে। সেলুনে ঢুকেই ক্যাপ্টেন আমায় বল্‌লে একটু ফিটফাট হয়ে নিতে। আমার শেভিং হতে হতেই চট করে প্রেজেণ্টেশনটা নিয়ে আসা যাবে বলে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতেই আমার মনে হলো, আমার পকেটে তো কিছুই নেই! শেভ করিয়ে চার্জ কোথা থেকে দেবো আমি? কথাটা বলতেই ঘোষ সাহেব পকেট থেকে চারটে খুচরো টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'সে কি! টেম্পোরারি হোক আর যাই হোক—চাকরি করছ, পকেট একদম খালি!—' ব'লেই বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

একটা মাথার চুল কাটার জন্যেই চার টাকা! বেশ দরাজ হাত তো লোকটার?

হ্যাঁ, তা'তো বটেই! চুল ছাঁটাইয়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে আমার নগদ আড়াই টাকা লাভ হয়েছে, বুঝলে মামিমা! সব হিসেব

করে দেখতে গেলে, তোমাদের ক্যাপ্টেন আমাকে এক শ টাকা 'চিট' করেছে বলা চলে না। এই বাসে দৌড়াদৌড়ির খরচ ধরলেও চিটিংএর পরিমাণ আটানব্বই টাকার বেশি বললে ক্যাপ্টেনের প্রতি অবিচার করা হবে, কি বলো মামিমা ?

খুব সূক্ষ্ম হিসেব করতে শিখেছ তো ! ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি যাবার সময় এই হিসেবী মাথাটা ছিল কোথায় ?

বেশ মজা তো ! চাকরি নেবার জন্য টেলিফোনে বাড়িতে ডেকে এনে এখন দোষ চাপানো হচ্ছে আমার ওপর ?

সুখেন্দুর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ধপাস্ করে খুলে যায় সামনের দরজাটা।

মা, ঐ দেখ, একটা লোককে মারতে মারতে একদম অজ্ঞান করে ফেলেছে রাস্তার লোকেরা। লোকটা নাকি কার পকেট মেরেছে। পুলিস এসে পড়ায় রক্ষে, নইলে লোকটাকে মেরেই ফেলতো হয়তো। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে, পুলিশ ধরে নিয়ে আসছে ঐ লোকটাকে। আর তার পেছনে পেছনে কতো লোক। তুফানের বেগে ঘরে ঢুকেই ইস্কুল-ফেরত সন্তু ও মণ্টু হাঁফাতে হাঁফাতে মাকে ডেকে এ কথা বলেই বিছানার ওপর ছমদাম করে বইপত্র ফেলে রেখেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইস্কুল থেকে বাসে আসতে রাস্তায় দত্তপুকুরে ঐ দৃশ্য দেখে তাদের আশ মেটেনি।

এসো সুখেন্দুদা !—শুধু নিজেরাই নয়, মাকে এবং সুখেন্দুকেও দুভাই বারান্দায় টেনে নিয়ে যায়।

সত্যি তো, দুটো পুলিশ একটা লোককে দুহাত ধরে টেনে নিয়ে আসছে আগে আগে ; পেছনে একগাদা লোক যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে লোকটাকে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরে পড়ছে ! সীমা আঁতকে ওঠে তাই দেখে।

আহা, এ রকম মারধোরের কী দরকার ? চোর ধরা পড়েছে, পুলিশের হাতে দিয়ে দাও।

আহা, পুলিশের হাতে দেবারই বা কী দরকার ! বাড়িতে ডেকে এনে চা-খাবার খাওয়ালেই হয়। তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষকে পেলে আমি তো টুকুরো-টুকুরো করে ফেলতাম।

যাক বাবা, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আমি কিন্তু মার-ধোর দেখতে পারি না। একটু বসো, সুখেন্দু। ছেলেদের খাবারটা দিয়ে দিই ; ওরা তো আবার চিৎকার শুরু করে দেবে।

ছেলেদের দুধ-চিঁড়ে আর কলার বৈকালিক ভোজের ব্যবস্থা করে দিয়ে সীমা চায়ের ব্যবস্থা করার হুকুম দেয় ভানুকে। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে কিছু লুচি-মিষ্টিও।

সুখেন্দু, বলো শুনি এখন তোমার বাকী কাহিনী।

বাকী কাহিনী তো এখন বুঝতেই পাচ্ছো। তবে শেষ অধ্যায়ে আধুনিক উপন্যাসের 'ষ্টাণ্ট'টা এখনো বলা হয়নি।

কি সেটা ?

সেলুনে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হেয়ার-কাটার চুলে মাত্র ক্লিফ চালিয়েছে, অমনি হঠাৎ আবার ক্যাপ্টেন এসে হাজির। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই 'হ্যালো ঘোষ' বলে' নির্বিকার ভাবে আমার ঘড়িটি চেয়ে বসলে। আমি তো অবাক্ ! সে বললে যে, তার নিজের ঘড়িটা নিয়ে আসতে ভুল হয়ে গিয়েছে—এদিকে ইণ্টারভ্যুর টাইমও হয়ে এলো। ঘোরাঘুরি করে সময়টার গোলমাল হয়ে যেতে পারে। তাই সঙ্গে একটা ঘড়ি নিয়ে বেরোনোই ভালো। সেই মনে করেই ক্যাপ্টেন আমার ঘড়িটি নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে এসেছে।

তাহলে তোমার ঘড়িটার ওপরও বেশ খেয়াল ছিল, দেখছি।

নিশ্চয়ই ! নেহাত ঘড়িটা খারাপ ছিল বলেই হাতছাড়া হয়নি। ঘড়িটা খারাপ, মেরামত করার জন্যেই আমি সেটা নিয়ে বেরিয়েছি—ক্যাপ্টেনকে সে কথা পরিষ্কার করে বলতেই সে আর একটুও দেরি না করে চলে গিয়েছিল, তাই রক্ষে। তা না হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, বলা যায় না।

কেন, সে আবার কি ?—সীমা খুব কৌতূহলের সঙ্গেই জিগ্যেস করে।

তাও জানতে চাইছ, মামিমা ? ক্যাপ্টেন আমার ঘড়ি চেয়ে ব্যর্থ হয়ে যাবার দু-এক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগলো। একবার ভাবলাম, এখনও ছুটে গেলে ব্যাটাকে ধরতে পারবো। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো এই আধ-ছাঁটা মাথা নিয়ে কি করেই বা বেরোন যায় ! কাজেই চুপ করে যেতে হলো।

দেখ, কি চমৎকার বুদ্ধি লোকটার ! তোমায় এমনি ভাবে চুল কাটতে বসিয়ে দিয়ে কেমন সুন্দর সট্‌কে পড়ার সুযোগ নিলে !

আমিও তাই এক-একবার ভাবছি মামিমা ! লোকটা যে পরিমাণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তাতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে এক শ টাকা ফী তার পক্ষে তেমন কিছুই বেশি নয়। পুরো ফী-টা তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটাই আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাই তো ছুটে এলাম জানতে আর এ সুখবরটাও দিতে এলাম যে, আমিও অল্প খেসারতেই সেরে এসেছি। ভাগ্যি, ক্যাপ্টেনের জালে তুমি খুব বেশি জড়িয়ে পড়নি। যে-রকম মিলিটারি আদব-কায়দা ও মিষ্টি কথাবার্তা, শেষ পর্যন্ত আমি তো বেকুব বনে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে লোকটা কতো কী-ই না করলে—দিল্লী-কোলকাতা, নানা ঘটনার উল্লেখ, ভারতীয় বিমান-বাহিনীর

নানা কথা, আমার ইণ্টারভ্যুর প্রশ্ন—আরও কতো কী! এমন কি, এয়ারফোর্সের ব্রোঞ্জের প্রতীক দেখাতেও ক্যাপ্টেন ভুল করেনি।

তাই নাকি, আমাকেও তো ব্রোঞ্জের ঐ অশোকচক্র দেখিয়েছিল!

বাস্তবিকই এমন নিখুঁত ভাবে এতো বড় একটা ব্যাপার চালানো যেতে পারে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেলুনে শেভ হয়ে দামটাম মিটিয়ে দিয়েও যখন দেখলাম, ক্যাপ্টেন আর ফিরছে না, তখন ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ জোচ্চুরি, তাতে আর কোন সন্দেহই রইল না।

তুমি কি করলে তখন?

কি আর করবো? বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই মাথায় হঠাৎ চন্ করে উঠলো, কি করে বেরুব? গেটে তো ট্যাক্সিওলা দাঁড়িয়ে। মনে পড়ে গেল, ট্যাক্সি থেকে নামবার সময়েই মিটারে চার্জ উঠেছিল বাইশ টাকা। তার পরে ওয়েটিং চার্জ আরো বেড়ে থাকবে। ড্রাইভার যদি গেট থেকে নামতেই আমার কাছে সে টাকাটা দাবী করে বসে, তখন উপায়?

ঠিকই তো, কি সাংঘাতিক!

কিন্তু সাংঘাতিক হলেও কি হবে মামিমা! হোটেলে তো আর মিছামিছি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। তাই খুব সাহস করে গটগট করে নেমে এলাম ওপর থেকে এবং সটান একটা বাসে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্যাক্সিটা ঠিক গেটের একটু আগেই দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার আমায় লক্ষ্য করেনি। আমি চলে আসার পরেও ঐ ট্যাক্সিওলা হোটেলের সামনে আরো কতোক্ষণ ছিল কে জানে?

ক্যাপ্টেন তা হলে দেখছি, এক গুলীতে একেবারে দুই শিকার করেছে।

কেন, শুধু তুই শিকার বলছ কেন ? তার গুলীর ছড়্‌রা এক-আধটুকু তোমার এবং মায়ের গায়েও তো লেগেছে। অমন আদর-অভ্যর্থনা !

ভানু চা ও লুচির প্লেট নিয়ে হাজির ইতিমধ্যে। এদিকে টেলিফোনটা আবার ক্রীং ক্রীং করে বেজে ওঠে। টেলিফোন বাজলেও রিসিভারটা তুলতে কারোরই যেন ভরসা হয় না। কে জানে এ আবার কোন্ ক্যাপ্টেন !

ক্রীং ক্রীং……

ধরোই না টেলিফোনটা।—সুখেন্দু তাগিদ দেয় সীমাকে।

কে ?

আমি অফিস থেকে বলছি। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সোজা অফিসেই এসে উঠেছি। কতকগুলো জরুরী কাজ রয়েছে। তাই আর আগে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হলো না। অফিসের কাজ সেরেই একেবারে যাব।

কিন্তু তা তো হ'লো। সুখেন্দুর একটা ভালো কাজ দু-একদিনের মধ্যে যোগাড় না করে দিলেই নয়।

কেন, কি হ'লো ? ওর চাকরি গেল নাকি এরই মধ্যে ?

না, তা নয় ; অনেক ব্যাপার আছে।

কি ব্যাপার, বলোই না।

না, অতো কথা আমি টেলিফোনে বলতে পারব না। ভীষণ ব্যাপার ! তুমি সুখেন্দুর সঙ্গে কথা বলো।—এই বলে সীমা সুখেন্দুকে ডাকে তার মামার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সুখেন্দু তাতে নারাজ। টেলিফোনে কিছুতেই সে এখন মামার সঙ্গে কথা বলবে না। ভয়ও লাগছে, লজ্জাও আছে। নির্বিবাদে চা খেয়েই সে চলেছে।

কি হ'লো ?—অফিস থেকে টেলিফোনে তাগিদ দেন করুণাবাবু।

না, কিছুতেই আসবে না সুখেন্দু। 'এসেই সব শুনবে, খুব মজার ব্যাপার! মোট কথা ছেলের জন্যে ভালো একটা চাকরি যোগাড় করো।

মাথামুণ্ডু কি বলছো, কিছুই ধরতে পারছি না!

করুণাবাবুর কথায় হো-হো করে হেসে ফেলে সীমা!

এতো হাসি কিসের, কিছুই তো বুঝে উঠতে পারছি না।

তোমার বোঝবার এখন কিছুই দরকার নেই। একটু তাড়াতাড়িই এসো।—সীমা এই বলে রিসিভারটা রেখে আবার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়।

খুব বাঁচিয়েছ মামিমা এখন কিছু না বলে। সারাদিনের ট্রেণজার্নির পর আমাদের এই বোকামীর কথা জানলে গালাগালি দিয়ে মামা আমাদের ঘাড়ের ভূত নামাতেন একেবারে।

চায়ের টেবিলে সীমা ও সুখেন্দুর মধ্যে যখন এ-আলাপ চলছে, করুণাবাবু তখন অফিসে বসে টেলিফোনে-শোনা সীমার রহস্যময় কলহাসির কথাই শুধু ভাবছেন। ভাবছেন, কী এমন সুখবর!

বাপ রে, একেবারেই যে নাছোড়বান্দা দেখছি! আচ্ছা, এক গেলাস জল দিন তো মা!

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে একটা আস্ত রসগোল্লাই মুখগহ্বরে ছুঁড়ে দেন ক্যাপ্টেন ঘোষ।

করুণাবাবুর ছোট্ট ছেলেটি এমনি সময় সে-ঘরে ছুটে আসতেই ক্যাপ্টেন খপ্ করে তাকে ধরে ফেলেন বাঁ-হাতে।

তোমার নাম কি খোকা?

পান্তু!—মাত্র পাঁচ বছর বয়স হলেও মোটেই ঘাবড়াবার পাত্র নয় সে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে নির্বিকার-চিত্তে কথাবার্তা বলায় সে অভ্যস্ত। ভয়-ডরের লেশমাত্রও নেই।

একটা মিষ্টি তুলে পান্তুর হাতে দিতেই সে-ও সেটা মুখে পুরে দিতে মুহূর্ত বিলম্ব করে না। মা জল আনতে গিয়েছেন। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বেন, সে আশঙ্কাটা তো আছে মনে।

ক্যাপ্টেন ঘোষকে রুমালে হাত এবং মুখ মুছতে দেখে পান্তু বিস্মিত হয়ে যায় যেন!

ঐ যে, আরও রইলো যে, খেলেন না?

তুমি খাবে?

না, মা বকবে!

না, বকবে না, এ সন্দেশটা তুলে নাও টুক্ করে—পান্তুকে এ কথা বলেই ক্যাপ্টেন ঘোষ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রান্নাঘরের দিকে।

এদিকে সীমাও উনুনে একবার তরকারিটা নাড়া দিয়ে জলের গেলাস নিয়ে বেরিয়েছেন। রান্নাঘরের দোরমুখেই ক্যাপ্টেন ঘোষ সীমার হাত থেকে জলের গেলাস নিয়ে যেই খেতে যাবেন, অমনি সামনের দরজা খুলে এসে দাঁড়িয়েছে সুখেন্দু।

আরে কে, এই ভাগ্নে না? আর জুতো খুলে ঘরে ঢোকবার সময় নেই। আগে চাকরিটা হ'য়ে যাক। পরে এসে একেবারে মিষ্টি হাতে নিয়ে মামিমার সঙ্গে দেখা করলেই চলবে।—এই বলে জলে চুমুক দিয়ে বা না দিয়েই গেলাসটা নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে পড়েন ক্যাপ্টেন। তারপর দরজা থেকেই সুখেন্দুকে জাপটে ধরে নিয়ে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান দুজনে।

সুখেন্দু, এই ক্যাপ্টেন ঘোষই তোমার জন্যে এতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। ইণ্টারভ্যুর খবরটা দিয়ে যেয়ো কিন্তু।—পেছন থেকে শুধু এইটুকু বলেই সীমা সুখেন্দুকে বিদায় দেয়। কিন্তু তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে না পেরে তার মনটা ভারি খারাপ লাগে।

সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছুটে রাস্তার দিকের গাড়ি-বারান্দায় যেতেই সীমা দেখতে পায়, সুখেন্দু ট্যাক্সির ভেতর থেকে মুখ বের করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ট্যাক্সিটা 'ফুস' করে ছেড়ে দেয়।

বেলা তখন প্রায় তিনটা।

খেয়ে-দেয়ে সীমা একটু বিশ্রাম করছিলো। শুয়ে শুয়ে একখানা উপন্যাস পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা তার নিজেরই খেয়াল নেই! বড়ো ছেলে দুটো ইস্কুলে, ছোট ছেলেটাও দুরন্তপনায় ক্লান্ত হয়ে তারই পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কে, কে?—ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন দরজায় বার বার 'নক' করছে শুনতে পায় সীমা। ঘুম থেকে উঠে বসে।

ভান্নু দেখ তো কে ডাকছে?

ভান্নুও ঘুমিয়েই পড়েছিল। সীমার ডাক শুনে উঠে দরজা খুলে দিতেই সুখেন্দু এসে ঘরে ঢোকে।

মামিমা কোথায় ?—জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে ভানুকে জিগ্যেস করে সুখেন্দু।

শোবার ঘরেই আছেন। ঘুম থেকে বোধ হয় উঠলেন এইমাত্র।

খুব সুখবর দিয়েছিলে মামিমা! আচ্ছা, ক্যাপ্টেন ঘোষ কি তোমাদের অনেক দিনের জানা-শুনো ?

সুখেন্দু শোবার ঘরে ঢুকতেই সীমা তার মুখে একটা কালিমার ছাপ লক্ষ্য করছিল। তার প্রশ্ন সীমাকে তাই আরও যেন চিন্তিত করে তোলে।

কি ব্যাপার, বলো তো ?

ব্যাপার পরে শুনবে, মামিমা! আগে বলো, ভদ্রলোককে তুমি আগে থেকেই জানতে কি না।

না, আমি তো কোন দিনই এঁকে আগে দেখিনি ? তবে আজ সকালবেলা টেলিফোন করে তোমার মামার সম্বন্ধে ভদ্রলোক এমন সব কথা বললেন, যাতে ওঁদের পরিচয়টা অনেক দিনের বলেই তো মনে হলো।

তা হলেই হয়েছে। লোকটা এক নম্বরের 'চিট্'।

সে কি!—সীমা আঁতকে ওঠে সুখেন্দুর কথা শুনে। ছাড়া-চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে জিগ্যেস করে—

তুমি কোথা থেকে এলে এখন ?

আর বলো না। তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়িতে ফিরে নাকে-মুখে কিছু গুঁজেই ছুটে এলাম তোমার কাছে। ভয় হচ্ছিল, আবার লোকটা এসে তোমার ঘাড়ে চাপলো কি না। তা ছাড়া খোঁজ নেয়া দরকার মনে হলো যে, সত্যিই লোকটা তোমাদের আগে থেকেই পরিচিত কি না। তখন তো তোমার সঙ্গে একটা কথা বলারও সুযোগ পাইনি।

হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম তখন। আমারও ভারি খারাপ লাগছিল, লোকটা যখন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলতে না দিয়ে তোমায় টেনে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা কি হয়েছে, এবার বল শুনি।

ব্যাপার আর কি! অল্পের ওপর দিয়েই বেঁচে গেছি, এই রক্ষে! এক শ টাকা মুক্তি-পণ দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছি। রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে যে ভাবে সে আলাপ করছিল, তারপর তোমার সামনেই সে আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বললো, তাতে লোকটার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসও আমার মনে শেষ পর্যন্ত উঁকি দিতে পারেনি। কাজেই সে আমাকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারতো, আর যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো।

সীমা শিউরে ওঠে সুখেন্দুর এ কথা শুনে।

তুমি শিউরে উঠছো মামিমা! একটা অপরিচিত লোক প্রথমে টেলিফোনে আলাপ-পরিচয় জমিয়ে, তার পরে ঘরে এসে গভীর অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়ে এমনি নিখুঁত অভিনয় যে করতে পারে, তার পক্ষে কোন কিছুই কি করা অসম্ভব?

সুখেন্দু যতোই বলে, সীমার চোখ দুটো ভয়ে-বিস্ময়ে যেন ততোই বড়ো হয়ে ওঠে।

ট্যাক্সি চড়ে ক্যাপ্টেন ঘোষের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম তো তোমাদের এখান থেকে। গাড়ি ছাড়তেই মামার যে কী প্রশংসা ক্যাপ্টেনের মুখে সে আর কি বলবো! দিল্লী থেকে প্রায় প্রতি মাসেই নাকি তাকে দু-একদিনের জন্যে কোলকাতায় আসতে হয়; আর মামার সঙ্গে দেখা না করে কোন বারেই নাকি লোকটা দিল্লী ফেরে না—মামার প্রতি এমনি তার টান! যাক, ট্যাক্সি শ্যামবাজার পেঁছুতেই ড্রাইভার বলে বসলো, সে আর যাবে

না। ক্যাপ্টেন একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে বুক-পকেট থেকে ছটি টাকা বের করে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড থেকে আরো বেশি জমকালো একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে জেঁকে বসলো। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে গাড়ি চলতে শুরু করলো এসপ্লানেডের দিকে।

তার পর ?

তারপর নতুন গাড়িতে উঠেই ক্যাপ্টেনের প্রথম কথা, বড্ড দেরি হয়ে গেল। কিন্তু তা হলেও ইণ্টারভ্যুর আগেই আসল কর্তাকে একটা 'প্রেজেণ্ট' দিয়ে হাত করে নিতে হবে। শ পাঁচেক টাকার কমে ওর মতো লোককে কোন প্রেজেণ্টেশন দেয়া চলে না, বুঝলে ভায়া ? তবে আমার কাছে শ দেড়েক টাকার মতো আছে। তুমি যদি আর কিছু টাকা দিতে পার, তা হলে কতক টাকা বাকি রেখে আমার চেনা একটা দোকান থেকেই প্রেজেণ্টেশনটা নিয়ে আসতে পারি। ক্যাপ্টেনের এ কথায় প্রথমটায় আমি একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। তবু কেন জানি, 'সম্ভব নয়' বলতে ভরসা হলো না। চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে! দেখাই যাক বাড়ি গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে পরামর্শ করে। এই ভেবে 'টাকার জন্যে একবার ঢাকুরিয়া যাওয়া দরকার' এ-কথা বললাম ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন আবার সময়ের অজুহাত তুলে প্রথমটায় কেমন যেন একটু বিরূপ ভাব দেখালো। তারপর একটু বিরক্তির সঙ্গে 'কি আর হবে ; চালাও জোরসে, ঢাকুরিয়া যানে হোগা'—হুকুম করলে ড্রাইভারকে।

তার পর ?

তার পর আর কি, গাড়ি সেণ্ট্রাল এভেন্যু ধরে এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোড হয়ে ঢাকুরিয়ার দিকে বেগে

এগিয়ে চলেছে। পথে ক্যাপ্টেনের মুখে কতো রকমের যে আশ্বাস, কতো উপদেশ—সে সব বলে লাভ নেই। আর মামার প্রশংসা তো কথায় কথায়! মামা নাকি দিল্লীতে গিয়ে কয়েক বছর আগে তাদের বাসাতেই উঠেছিলেন। সেবার ক্যাপ্টেনের বাবা-মা নাকি মামাকে এতো আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন যে, সে-কথা মামা প্রতিবারেই নাকি ক্যাপ্টেনেকে শুনিয়ে থাকেন।

সে কি! সেবার তো আমরা সবাই মিলে দিল্লী গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় এবং সে ভদ্রলোক তোমার মামারই এক কলেজের বন্ধু।

তা হলে বুঝতেই পারছো, এবার ক্যাপ্টেন ঘোষ লোকটি কি চিজ! তার পরে প্রতিবারেই নাকি কোলকাতায় এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, আর তোমার আদর-যত্নে সে একেবারে অভিভুত! সকালবেলা দোর খুলে যা' দেখলাম, তাতে তার এ সব কথায় আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়নি বরং মুহূর্তের জন্যে তোমাদের সঙ্গে যেটুকু অন্তরঙ্গতা সকালবেলা লক্ষ্য করেছি এবং যে ভাবে ক্যাপ্টেন তোমাদের সম্পর্কে নানা নতুন-পুরনো কথা তুলেছে, তাতে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করে উপায়ই বা কি?

ঐ লোকটাকে কি তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলে?

তা গিয়েছি বৈ কি! ক্যাপ্টেন শুধুমাত্র তোমার দেয়া চা-মিষ্টি খেয়েই পরিতুষ্ট হবে, সেই-বা কেমন কথা? আমাদের বাড়িতে ঢুকেই মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে 'পিসিমা' সম্বোধন! আর কি কথা আছে! একে মধুর 'পিসিমা' ডাক, তার পরে ছেলের চাকরি করে দেবে! পরিশ্রান্ত ভাইপোর ক্লান্তি দূর করার জন্যে মায়ের তখন সে কি চেষ্টা! তাড়াতাড়ি ইয়া-বড়ো এক

গেলাস ঘোলের সরবৎ এসে পড়ল! অবশ্য আমিও সেই সঙ্গে ছোট এক গেলাস সরবৎ পেয়েছিলাম। সে কথা থাক। অল্প একটু সময়ের মধ্যে তোমাদের নানা গুণগান করে মা আর বাবাকেও ক্যাপ্টেন ঘোষ সহজেই অভিভূত করে ফেললে, আর 'সময় নেই' বলে এমন তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলে যে, আমার চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করারও সুযোগ পেলাম না।

তার পর কি হলো?—সুখেন্দুর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে সীমা।

তার পরে কি আর বলবো মামিমা! অল্প কতোক্ষণ সময়ের মধ্যে ঝড়ের গতিতে যেন সব-কিছু ঘটে গেল। ক্যাপ্টেনের তাড়ায় মা আড়াই শ টাকা চেয়ে ন-মামার কাছে একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। মাসের শেষ, তাঁর হাতেও তখন আড়াই শ টাকা ছিল না। তাই তিনি এক শ টাকা দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তক্ষুণি তার বেশি দেবার আর ক্ষমতা নেই তাঁর। ভাগ্যি, তাঁর কাছে আর বেশি টাকা ছিল না; থাকলে আরো কতোগুলো টাকা নষ্ট হতো মিছামিছি।

এক শ টাকা পেয়েই বুঝি ক্যাপ্টেনকে দিয়ে দিলে? টাকাটা পেয়ে কি বললে লোকটা?

না, টাকাটা সঙ্গে সঙ্গেই দেইনি। টাকা পেয়েই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আমি বেরিয়ে আসি। আসার সময় ক্যাপ্টেন মাকে ও বাবাকে বেশ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করলে। শুধু তাই নয়, নিজের গরজেই মিষ্টি খাওয়ার একটা নেমন্তন্নও আদায় করে নিলে।

সে কি রকম?

কী রকম আবার? মাকে প্রণাম করে বেশ খোলামনেই বলে ফেললে, 'শুধু এই ঘোল খেয়েই বিদায় হচ্ছি মনে করবেন না

পিসিমা ; সুখেন্দুর কাজটার ব্যবস্থা করেই আবার ফিরে আসছি। মিষ্টি পাওনা রইল।' মা তো আনন্দে ফেটে পড়েন আর কি, বাবাও খুশিতে ভরপূর। দুজনেই সমস্বরে বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আসবে, বিকেল বেলা চা-মিষ্টির নেমন্তন্ন রইল।'

বাঃ, বেশ তো মজা!—সীমা অবাক্ হয়ে যায় কাহিনী শুনে।

মজা তো বেশ। ভাগ্যি, লেভেল ক্রশিং-এর গেটটা বন্ধ থাকায় ট্যাক্সিটা রেল-লাইনের ওপারেই ছিল। তা না হলে ড্রাইভারের হাতে নাস্তানাবুদ হতে হতো।

কেন?

কেন, তা পরেই টের পাবে ; আগে সবটা শুনেই নাও। তবে এখন শুধু এটুকু তোমাকে বলে রাখছি যে, ড্রাইভার আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িটা চিনে রাখতে পারলে তোমার এখানে আজ আর এখন আসতেই পারতাম না।

ঠিক আছে। তার পরে কি হলো, তাই বলো।

ক্যাপ্টেনকে নিয়ে তো বেরিয়ে এলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের এপারে এসে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ছুটলাম এসপ্লানেডের দিকে। গাড়িতে বসেই এক শ টাকার নোটখানা ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে আর বেশি টাকা দেবার অক্ষমতা জানালাম। ক্যাপ্টেন প্রথমটায় কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করলে টাকাটা নিতে। একবার বললেও 'এই সামান্য টাকায় কি করেই বা কি করি!' তার পর একটু চিন্তা করে আবার বললে, 'শ আড়াই টাকা দিয়ে আর শ আড়াই বাকি রেখে এখনকার মতো প্রেজেণ্টশনটা কিনে নেয়া যাক। পরে বাকি টাকাটা শোধ করে দিলেও চলবে।' এই বলে ক্যাপ্টেন টাকাটা তার বুকপকেটে তুলে নিলে।

আচ্ছা, এ টাকাটা দেবার সময়ও কি তোমার মনে কোন রকম সন্দেহ হয়নি ?

আরে কি মুশকিল ! সন্দেহ হবার মতো কোন অবকাশই তো ক্যাপ্টেন দেয়নি। নেহাত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টাকাটা পকেটে পুরেই ইণ্টারভ্যু সম্পর্কে আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দিতে লেগে গেল লোকটা। এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এবং তার উত্তর আমাকে বলে দিয়ে বললে যে, এটা কিন্তু কিছুতেই ভুল করলে চলবে না। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে এই প্রশ্নটি যেমনি সূক্ষ্ম, তার বলে-দেয়া উত্তরটিও ছিল তেমনি নিখুঁত। এর পরে তাকে সন্দেহ করার আর কোন উপায় থাকতে পারে, বলো ?

তাতো ঠিকই। আচ্ছা, তোমরা কোন্ দোকানে গেলে প্রেজেণ্টেশন কিনতে ?

শোনই না ব্যাপার। প্রেজেণ্টেশন কিনতে কি আর আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে সে ? তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষ কি অতো বোকা ছেলে !

হঠাৎ পাশের ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটোর কাচ ঝন্-ঝন্ করে ভেঙে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কি হলো ? শব্দ শুনে সীমা ও সুখেন্দু দুজনেই ছুটে যায় সেখানে। গিয়ে দেখে ঘরের এক কোণে অপরাধীর মতো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে পান্তু। এই তো একটু আগে ঘুম থেকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে কখন যে বল খেলা শুরু করে দিয়েছে ; আর এরি মধ্যে এই কাণ্ড !

বাবা আসুক, দেখবে মজা দুষ্ট ছেলে। এই বলে সীমা ছুটে গিয়ে হিড়হিড় করে কান ধরে টেনে নিয়ে আসে পান্তুকে। সুখেন্দু মামিমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় ছেলেটাকে। নইলে দু-এক ঘা যে ছেলেটার পিঠে পড়তো তাতে সন্দেহ নেই।

যাক্ গে, ভারি তো একটা ফটোর গ্লাস ভেঙেছে। আমার তো চিন্তা হয়েছিল, তোমার কাছ থেকেও ক্যাপ্টেন ঘোষ পটিয়ে কিছু বের করে নিয়েছে কি না!

হ্যাঁ, নিলেই হলো! আমার কাছ থেকে এতোই সোজা!

না, সোজা যে নয়, তার তো খুবই পরিচয় দিয়েছ। জামাই-আদরে চা-মিষ্টি খাইয়ে ভাগ্নের জন্যে মস্ত এক মুরুব্বী যোগাড় করেছ! সে যাক্ গে। ক্যাপ্টেনের প্রেজেণ্টেশন কেনার রহস্যটাই এখন শোন। এসপ্লানেড অঞ্চলে একটা বড়ো হোটেলের সামনে আসতেই গাড়ি থামাবার হুকুম হলো। সাহেবের পেছন-পেছন আমিও নেমে এলাম। ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে সঙ্গে করে গটগট করে হোটেলের ভেতর চলে গেল। হঠাৎ গিয়ে উঠলাম ঐ হোটেলেরই একটা হেয়ার-কাটিং সেলুনে। সেলুনে ঢুকেই ক্যাপ্টেন আমায় বল্লে একটু ফিটফাট হয়ে নিতে। আমার শেভিং হতে হতেই চট করে প্রেজেণ্টেশনটা নিয়ে আসা যাবে বলে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতেই আমার মনে হলো, আমার পকেটে তো কিছুই নেই! শেভ করিয়ে চার্জ কোথা থেকে দেবো আমি? কথাটা বলতেই ঘোষ সাহেব পকেট থেকে চারটে খুচরো টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'সে কি! টেম্পোরারি হোক আর যাই হোক—চাকরি করছ, পকেট একদম খালি!—' ব'লেই বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

একটা মাথার চুল কাটার জন্যেই চার টাকা! বেশ দরাজ হাত তো লোকটার?

হ্যাঁ, তা'তো বটেই! চুল ছাঁটাইয়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে আমার নগদ আড়াই টাকা লাভ হয়েছে, বুঝলে মামিমা! সব হিসেব

করে দেখতে গেলে, তোমাদের ক্যাপ্টেন আমাকে এক শ টাকা 'চিট' করেছে বলা চলে না। এই বাসে দৌড়াদৌড়ির খরচ ধরলেও চিটিংএর পরিমাণ আটানব্বই টাকার বেশি বললে ক্যাপ্টেনের প্রতি অবিচার করা হবে, কি বলো মামিমা ?

খুব সূক্ষ্ম হিসেব করতে শিখেছ তো! ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি যাবার সময় এই হিসেবী মাথাটা ছিল কোথায় ?

বেশ মজা তো! চাকরি নেবার জন্য টেলিফোনে বাড়িতে ডেকে এনে এখন দোষ চাপানো হচ্ছে আমার ওপর ?

সুখেন্দুর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ধপাস্ করে খুলে যায় সামনের দরজাটা।

মা, ঐ দেখ, একটা লোককে মারতে মারতে একদম অজ্ঞান করে ফেলেছে রাস্তার লোকেরা। লোকটা নাকি কার পকেট মেরেছে। পুলিস এসে পড়ায় রক্ষে, নইলে লোকটাকে মেরেই ফেলতো হয়তো। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে, পুলিশ ধরে নিয়ে আসছে ঐ লোকটাকে। আর তার পেছনে পেছনে কতো লোক। তুফানের বেগে ঘরে ঢুকেই ইস্কুল-ফেরত সন্তু ও মণ্টু হাঁফাতে হাঁফাতে মাকে ডেকে এ কথা বলেই বিছানার ওপর দুমদাম করে বইপত্র ফেলে রেখেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইস্কুল থেকে বাসে আসতে রাস্তায় দত্তপুকুরে ঐ দৃশ্য দেখে তাদের আশ মেটেনি।

এসো সুখেন্দুদা!—শুধু নিজেরাই নয়, মাকে এবং সুখেন্দুকেও দুভাই বারান্দায় টেনে নিয়ে যায়।

সত্যি তো, দুটো পুলিশ একটা লোককে দুহাত ধরে টেনে নিয়ে আসছে আগে আগে ; পেছনে একগাদা লোক যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে লোকটাকে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরে পড়ছে! সীমা আঁতকে ওঠে তাই দেখে।

আহা, এ রকম মারধোরের কী দরকার ? চোর ধরা পড়েছে, পুলিশের হাতে দিয়ে দাও।

আহা, পুলিশের হাতে দেবারই বা কী দরকার ! বাড়িতে ডেকে এনে চা-খাবার খাওয়ালেই হয়। তোমাদের ক্যাপ্টেন ঘোষকে পেলে আমি তো টুকুরো-টুকুরো করে ফেলতাম।

যাক বাবা, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আমি কিন্তু মার-ধোর দেখতে পারি না। একটু বসো, সুখেন্দু। ছেলেদের খাবারটা দিয়ে দিই ; ওরা তো আবার চিৎকার শুরু করে দেবে।

ছেলেদের দুধ-চিঁড়ে আর কলার বৈকালিক ভোজের ব্যবস্থা করে দিয়ে সীমা চায়ের ব্যবস্থা করার হুকুম দেয় ভানুকে। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে কিছু লুচি-মিষ্টিও।

সুখেন্দু, বলো শুনি এখন তোমার বাকী কাহিনী।

বাকী কাহিনী তো এখন বুঝতেই পাচ্ছো। তবে শেষ অধ্যায়ে আধুনিক উপন্যাসের 'ষ্টাণ্ট'টা এখনো বলা হয়নি।

কি সেটা ?

সেলুনে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হেয়ার-কাটার চুলে মাত্র ক্লিফ চালিয়েছে, অমনি হঠাৎ আবার ক্যাপ্টেন এসে হাজির। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই 'হ্যালো ঘোষ' বলে' নির্বিকার ভাবে আমার ঘড়িটি চেয়ে বসলে। আমি তো অবাক্! সে বললে যে, তার নিজের ঘড়িটা নিয়ে আসতে ভুল হয়ে গিয়েছে—এদিকে ইণ্টারভ্যুর টাইমও হয়ে এলো। ঘোরাঘুরি করে সময়টার গোলমাল হয়ে যেতে পারে। তাই সঙ্গে একটা ঘড়ি নিয়ে বেরোনোই ভালো। সেই মনে করেই ক্যাপ্টেন আমার ঘড়িটি নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে এসেছে।

তাহলে তোমার ঘড়িটার ওপরও বেশ খেয়াল ছিল, দেখছি।

নিশ্চয়ই! নেহাত ঘড়িটা খারাপ ছিল বলেই হাতছাড়া হয়নি। ঘড়িটা খারাপ, মেরামত করার জন্যেই আমি সেটা নিয়ে বেরিয়েছি—ক্যাপ্টেনেকে সে কথা পরিষ্কার করে বলতেই সে আর একটুও দেরি না করে চলে গিয়েছিল, তাই রক্ষে। তা না হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, বলা যায় না।

কেন, সে আবার কি?—সীমা খুব কৌতূহলের সঙ্গেই জিগ্যেস করে।

তাও জানতে চাইছ, মামিমা? ক্যাপ্টেন আমার ঘড়ি চেয়ে ব্যর্থ হয়ে যাবার ছ্-এক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগলো। একবার ভাবলাম, এখনও ছুটে গেলে ব্যাটাকে ধরতে পারবো। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো এই আধ-ছাঁটা মাথা নিয়ে কি করেই বা বেরোন যায়! কাজেই চুপ করে যেতে হলো।

দেখ, কি চমৎকার বুদ্ধি লোকটার! তোমায় এমনি ভাবে চুল কাটতে বসিয়ে দিয়ে কেমন সুন্দর সট্‌কে পড়ার সুযোগ নিলে!

আমিও তাই এক-একবার ভাবছি মামিমা! লোকটা যে পরিমাণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তাতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে এক শ টাকা ফী তার পক্ষে তেমন কিছুই বেশি নয়। পূরো ফী-টা তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটাই আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাই তো ছুটে এলাম জানতে আর এ সুখবরটাও দিতে এলাম যে, আমিও অল্প খেসারতেই সেরে এসেছি। ভাগ্যি, ক্যাপ্টেনের জালে তুমি খুব বেশি জড়িয়ে পড়নি। যে-রকম মিলিটারি আদব-কায়দা ও মিষ্টি কথাবার্তা, শেষ পর্যন্ত আমি তো বেকুব বনে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে লোকটা কতো কী-ই না করলে—দিল্লী-কোলকাতা, নানা ঘটনার উল্লেখ, ভারতীয় বিমান-বাহিনীর

নানা কথা, আমার ইন্টারভ্যুর প্রশ্ন—আরও কতো কী! এমন কি, এয়ারফোর্সের ব্রোঞ্জের প্রতীক দেখাতেও ক্যাপ্টেন ভুল করেনি।

তাই নাকি, আমাকেও তো ব্রোঞ্জের ঐ অশোকচক্র দেখিয়েছিল!

বাস্তবিকই এমন নিখুঁত ভাবে এতো বড় একটা ব্যাপার চালানো যেতে পারে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেলুনে শেভ হয়ে দামটাম মিটিয়ে দিয়েও যখন দেখলাম, ক্যাপ্টেন আর ফিরছে না, তখন ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ জোচ্চুরি, তাতে আর কোন সন্দেহই রইল না।

তুমি কি করলে তখন?

কি আর করবো? বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই মাথায় হঠাৎ চন্ করে উঠলো, কি করে বেরুব? গেটে তো ট্যাক্সিওলা দাঁড়িয়ে। মনে পড়ে গেল, ট্যাক্সি থেকে নামবার সময়েই মিটারে চার্জ উঠেছিল বাইশ টাকা। তার পরে ওয়েটিং চার্জ আরো বেড়ে থাকবে। ড্রাইভার যদি গেট থেকে নামতেই আমার কাছে সে টাকাটা দাবী করে বসে, তখন উপায়?

ঠিকই তো, কি সাংঘাতিক!

কিন্তু সাংঘাতিক হলেও কি হবে মামিমা! হোটেলে তো আর মিছামিছি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। তাই খুব সাহস করে গটগট করে নেমে এলাম ওপর থেকে এবং সটান একটা বাসে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্যাক্সিটা ঠিক গেটের একটু আগেই দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার আমায় লক্ষ্য করেনি। আমি চলে আসার পরেও ঐ ট্যাক্সিওলা হোটেলের সামনে আরো কতোক্ষণ ছিল কে জানে?

ক্যাপ্টেন তা হলে দেখছি, এক গুলীতে একেবারে দুই শিকার করেছে।

কেন, শুধু তুই শিকার বলছ কেন ? তার গুলীর ছড়্রা এক-আধটুকু তোমার এবং মায়ের গায়েও তো লেগেছে। অমন আদর-অভ্যর্থনা !

ভান্থ চা ও লুচির প্লেট নিয়ে হাজির ইতিমধ্যে। এদিকে টেলিফোনটা আবার ক্রীং ক্রীং করে বেজে ওঠে। টেলিফোন বাজলেও রিসিভারটা তুলতে কারোরই যেন ভরসা হয় না। কে জানে এ আবার কোন্ ক্যাপ্টেন !

ক্রীং ক্রীং……

ধরোই না টেলিফোনটা।—সুখেন্দু তাগিদ দেয় সীমাকে।

কে ?

আমি অফিস থেকে বলছি। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সোজা অফিসেই এসে উঠেছি। কতকগুলো জরুরী কাজ রয়েছে। তাই আর আগে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হলো না। অফিসের কাজ সেরেই একেবারে যাব।

কিন্তু তা তো হ'লো। সুখেন্দুর একটা ভালো কাজ দু-একদিনের মধ্যে যোগাড় না করে দিলেই নয়।

কেন, কি হ'লো ? ওর চাকরি গেল নাকি এরই মধ্যে ?

না, তা নয় ; অনেক ব্যাপার আছে।

কি ব্যাপার, বলোই না।

না, অতো কথা আমি টেলিফোনে বলতে পারব না। ভীষণ ব্যাপার ! তুমি সুখেন্দুর সঙ্গে কথা বলো।—এই বলে সীমা সুখেন্দুকে ডাকে তার মামার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সুখেন্দু তাতে নারাজ। টেলিফোনে কিছুতেই সে এখন মামার সঙ্গে কথা বলবে না। ভয়ও লাগছে, লজ্জাও আছে। নির্বিবাদে চা খেয়েই সে চলেছে।

কি হ'লো ?—অফিস থেকে টেলিফোনে তাগিদ দেন করুণাবাবু।

না, কিছুতেই আসবে না সুখেন্দু। এসেই সব শুনবে, খুব মজার ব্যাপার! মোট কথা ছেলের জন্যে ভালো একটা চাকরি যোগাড় করো।

মাথামুণ্ডু কি বলছো, কিছুই ধরতে পারছি না!

করুণাবাবুর কথায় হো-হো করে হেসে ফেলে সীমা!

এতো হাসি কিসের, কিছুই তো বুঝে উঠতে পারছি না।

তোমার বোঝবার এখন কিছুই দরকার নেই। একটু তাড়াতাড়িই এসো।—সীমা এই বলে রিসিভারটা রেখে আবার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়।

খুব বাঁচিয়েছ মামিমা এখন কিছু না বলে। সারাদিনের ট্রেণজার্নির পর আমাদের এই বোকামীর কথা জানলে গালাগালি দিয়ে মামা আমাদের ঘাড়ের ভূত নামাতেন একেবারে।

চায়ের টেবিলে সীমা ও সুখেন্দুর মধ্যে যখন এ-আলাপ চলছে, করুণাবাবু তখন অফিসে বসে টেলিফোনে-শোনা সীমার রহস্যময় কলহাসির কথাই শুধু ভাবছেন। ভাবছেন, কী এমন সুখবর!

চিরাচরিত

ভোর ছ'টায় ট্রেণ। একেবারে একটানা কোলকাতা।

অনন্ত তাই সকালের ট্রেণে যাওয়াই ঠিক করে। গরমের দিন। সকালের ঠাণ্ডা রোদে ঘণ্টা চারেকের পথ বিনা কষ্টেই পার হওয়া যাবে। অনন্ত তাই এ সিদ্ধান্তই করেছে। তা ছাড়া আগে যাবারই বা কী দরকার? কলেজ খোলার দিন সকালে রওনা হলেও যখন কোলকাতায় কলেজ করায় কোন অসুবিধেই হয়না তখন একদিন আগে রওনা হয়ে এসেই বা কী লাভ?

কৃষ্ণনগরে অমন ভালো কলেজ থাকতেও কোলকাতায় পড়া, মনের শখ মেটানোই তার একমাত্র কারণ। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছুটির একটি দিনও হাতে রেখে কোলকাতায় যেতে মন চায় না। একদিন তো বড়ো কথা, একটা ঘণ্টাও যদি বেশি থেকে যাওয়া যায় তাই যেন পরম কাম্য। কৃষ্ণনগরের ছেলের কাছে কৃষ্ণনগরের মাটির এমনি টান।

ট্রেণ ছাড়ার ঠিক মুখেই এসে ট্রেণ ধরে অনন্ত।

রাত থাকতেই ঘুম না ভাঙলে ছটার ট্রেণ ধরা খুবই মুশকিল। তবু ভাগ্যি রাতারাতি সব জিনিসপত্রই গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। আর জিনিসপত্রই বা তেমন আর কি—একটা বেডিং, বই ও জামা-কাপড়ের একটা সুটকেশ আর রুমমেট্ ও বন্ধুদের জন্যে কৃষ্ণনগরের এক বাক্স সরপুরিয়া।

প্রথম যেবার অনন্ত তার কলেজ বন্ধুদের এক ঘরোয়া চায়ের আসরে এই সরপুরিয়া খাইয়েছিল সে সময়ই তার বন্ধুরা তাকে এক কঠোর চুক্তি-শর্তে আবদ্ধ করেছিল। অতঃপর ছুটি-ফেরত কোলকাতায় আসার সময় সরপুরিয়া না নিয়ে এলে অনন্তকে

হোস্টেলে ঢুকতেই দেওয়া হবে না, এই ছিল কড়ার। রুমমেট শঙ্কর তো কদিন গভীর রাতে সরপুরিয়ার স্বপ্ন দেখে একেবারে ডেকেই তুলছে অনন্তকে। এ অবস্থায় পূজো আর গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ জীবনের কটা বছর বন্ধুদের জন্যে সরপুরিয়া না নিলে কি আর উপায় আছে ?

ইণ্টার ক্লাসের একটা খালি কামরায় দৌড়ে এসে উঠে বসতেই গাড়িটা ছেড়ে দেয়। জানলা দিয়ে কুলি বিদায় করে মালপত্র একটু গুছিয়ে নেয় অনন্ত। তারপর মুক্ত কামরায় গা এলিয়ে দিয়ে 'বাঁশরী' সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যেতে থাকে। তেমন কিছু পড়ার না থাকলেও 'বাঁশরী'কে ভালো লাগে অনন্তর। 'বাঁশরী' যে কৃষ্ণ-নগরেরই মুখপত্র। হোক না সামান্য, তবু যে সে আপন ঘরের দুলালী ! অনন্ত তাই প্রতিবারই কোলকাতা যাবার পথে একখানা 'বাঁশরী' হাতে নিয়েই ট্রেণে ওঠে।

দেখতে দেখতে ট্রেণটা এসে থামে বাদকুল্লা স্টেশনে। ঠিক হয়ে উঠে বসে অনন্ত। একা একা মুখ বুজে থাকতে আর ভালোও লাগছে না। ঐ যে চাওয়ালা হাঁকছে, একটু চা-ই খাওয়া যাক। মেটে বাটিতে একভার চা নিতেই এক বুড়ো বৈরাগী কুঁজো হয়ে একতারা বাজিয়ে গাইতে গাইতে অনন্তর কামরার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়—

"আমি সব হারায়ে বৈরাগী,
তাই অনুরাগের তৃষ্ণা জাগে।"

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বৈরাগীকেও চারটে পয়সা দিয়ে খুশি করে অনন্ত।

বৈরাগী তার ঝোলায় পয়সা রেখে এগিয়ে যায়। তার এক-তারার একটানা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া অন্তরঙ্গ গানের রেশ তখনও অনন্তর কানে বাজতে থাকে।

পরিবেশটিও অপূর্ব, সকালের কাঁচা রোদের রূপালী ঢেউ রেল লাইনের দুপাশের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে খেলে খেলে অদৃশ্য হয়ে যায় বৈরাগীর গানের সুরের রেশেরই মতো। ডানদিকে অদূরে মাঠের ওপর বাদকুল্লার নতুন বাজার। তখনো সে বাজার তেমন কোলাহলমুখর হয়ে ওঠেনি। বাঁদিকে আমগাছের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে গিয়ে সাদা আকাশের সঙ্গে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু এ কি, বাদকুল্লা স্টেশনে এতোক্ষণ! অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে নিজের মনকে। মিনিট দেড়েকমাত্র গাড়ি দাঁড়ানোর কথা এখানে। লাইন ক্লিয়ার বোধহয় পাওয়া যাচ্ছে না কোন কারণে।

সুসজ্জিত দুটি যুবক এসে হঠাৎ উঠে পড়ে অনন্তর কামরায়। তাদের সঙ্গে মালপত্র নেই কিছু। একজনের হাতে বড়ো একখানা বই, আর একজনের সঙ্গে দুখানা বিলিতী ম্যাগ্যাজিন।

এ ট্রেণ কখন যেয়ে কোলকাতা পৌঁছবে কে জানে?—অনন্তর পাশের সিটে বসতে বসতে যুবকদের মধ্যে একজন বলে তার বন্ধুকে লক্ষ্য করেঃ কেন, কি হয়েছে বলুন তো।—অস্থির অনন্ত আর থাকতে পারে না জিগ্যেস না করে।

আর বলবেন না মশাই, ভেবেছিলাম ভোরের ট্রেণটা ধরে ঠিক সময়েই কোলকাতা পৌঁছে কলেজটা করতে পারবো। কিন্তু তা আর বোধহয় হবে না।

কেন, কী ব্যাপার?

ব্যাপার আর কি! উদ্বাস্তুদের হাতে দেশটা সবাই মিলে তুলে দিয়েছেন, তার ভোগ ভুগতে হবে না? ওরা ট্রেণ চলতে দিলে তো

ট্রেণ চলবে। ওদের মর্জির ওপরই তো আজকাল সবকিছু নির্ভর করছে।

নবাগত অন্যতম যাত্রীর এ-কথায় বেদনা বোধ করে অনন্ত। তবু আর একবার প্রশ্ন করে—কী করেছে উদ্বাস্তুরা ?

কি আর করবে,—অবিলম্বে তাদের পুনর্বাসনের দাবীতে রেল লাইনের ওপর সত্যাগ্রহ শুরু করে দিয়েছে দল বেঁধে! আচ্ছা বলুন তো মশাই, উদ্বাস্তুদের জন্যে রেল কোম্পানীর কি করার থাকতে পারে ?—এই বলে যুবকটি হাতের আমেরিকান 'লাইফ' ম্যাগাজিন-খানা খুলে ছবির পর ছবি দেখে যেতে থাকে।

দেখি দেশলাইটা।—উপন্যাসের পাতায় মুখ রেখেই হাত বাড়িয়ে দেশলাই চায় তার বন্ধু উল্টোদিকের বেঞ্চি থেকে। তামাকুর ধোঁয়াটে রসে সিক্ত হয়ে ওঠে উপন্যাস পড়ার নেশা। 'লাইফ'-এর এক পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী উলঙ্গ নারীর ফটোচিত্রের দিকে বন্ধুর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিদেশিনী তরুণীর অসামান্য দেহ-লাবণ্য দর্শনে চোখ দুটো যেন বড়ো হয়ে উঠেছে তার। সামান্য দূর থেকে অনন্তরও লক্ষ্য পড়ে সে দিকে। তবু সে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ একটা হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে ট্রেণটা আবার চলতে শুরু করে।

উঃ, বাঁচা গেল !

দেখলেন তো মশাই ব্যাপারটা। বেটারা মিছামিছি গাড়িটাকে পনরো বিশ মিনিট লেট করিয়ে দিলে! খেয়েদেয়ে কাজ নেই বেটাদের, রাত তিনটে থেকে এসে ট্রেণের লাইনে বসে আছেন।

আরে দীপঙ্কর, আমার ছাতাটা ? যাঃ, টিকিট কেনার সময়ে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, সেখানেই ফেলে এসেছি বোধহয়। কি করা যায় বলতো। শিকল টেনে ট্রেণটা থামিয়ে একবার দেখে

আসবো দৌড়ে ? একেবারে নতুন ছাতা !—ছ্যাৎ করে ওঠে সাধনের বুকটা। কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ে সে। একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আরে দূর পাগল, এখনো তোর নতুন ছাতা বসে আছে কিনা স্টেশনে তোর অপেক্ষায় ! সে ছাতা কোথায় চলে গেছে, কোন্ মাথায় শোভা পাচ্ছে এখন তার হদিস করবে এমন সাধ্যি কারুরই নেই। কাজেই যা হবার হয়েছে, বোস্ তুই চুপ করে।—দীপঙ্কর ধমকে দেয় সাধনকে।

সাধন কিন্তু বসতে পারে না। কামরার মধ্যেই এদিক্ ওদিক্ করতে থাকে। একবার জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখে নেয় বাদকুল্লা স্টেশন তখনো দেখা যায় কিনা। সে স্টেশন দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে অনেক আগেই।

কি হলো তোর, বসে থাক না। একটা ছাতার জন্যে কি বিশ্রী রকম পাগলামিই না শুরু করে দিয়েছিস্ ?—দীপঙ্কর কড়া কড়া কথা বলে বসিয়ে দেয় তার বন্ধুকে। তখনো সে উপন্যাস পড়া নিয়েই মত্ত।

কিছু মনে করবেন না, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। একটা ছাতার জন্যে আপনার বন্ধু এমনি উতলা হয়ে পড়েছেন, অথচ যারা তাদের ভিটেমাটি সব হারিয়ে শুধু মানুষের মতো বাঁচার সুযোগের দাবীতে হন্যে হয়ে ফিরছেন তাদের প্রতি তার বিরক্তি দেখে আমার তো অবাক্ লাগছিল।

হ্যাঁ মশাই, বিরক্ত হবো না তো কি ? ঐ আপনাদের উদ্বাস্তুদের জন্যেই আমার ছাতাটি খোয়া গেল। তারা সব রেল লাইন আটক করে বসে আছে, টিকিট কিনতে গিয়ে স্টেশনে এ আলোচনায় কান পড়তেই আমি ভুলে ফেলে এসেছি ছাতাটা।—সাধন বেশ একটু উত্তেজনার ঝাঁজ মিশিয়েই জবাব দেয় অনন্তর কথায়।

থাক, এ নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই। আমায় মাফ করবেন, আমার কথা আমি উইথড্র করছি। আচ্ছা, আপনার ঐ নিউ টাইমস্ ম্যাগাজিনখানা একটু দেখতে পারি কি?

সে কি, স্বচ্ছন্দে পারবেন! আপনিও কিছু মনে করবেন না আমার কথায়। উদ্বাস্তুরা এক এক সময় বড্ড বাড়াবাড়ি করে বলেই তো বিরক্তি আসে।—এই বলে 'নিউ টাইমস্'খানা সাধন এগিয়ে দেয় অনন্তর হাতে।

গাড়ি পরের স্টেশনে আসতেই জানা যায় যে, মহকুমা হাকিমের মুখ থেকে তাদের দাবী বিবেচনার আশ্বাসবাণী পেয়ে উদ্বাস্তুরা ছয় ঘণ্টা রেল লাইনে অবস্থানের পর সত্যাগ্রহ ভঙ্গ করেছে।

এই স্টেশন থেকেও একজন মহিলাসহ তিনজন যাত্রী উঠেন অনন্তদের কামরায়। তাদেরই মধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোক বলেন যে, রেল লাইনে উদ্বাস্তুরা সত্যাগ্রহ শুরু করেছে শুনে তো মনে হয়েছিল, আর ট্রেণ পাবার আশা নেই। যাক অল্পেতেই মিটে গেল, রক্ষে! কী আর করবে বেচারীরা, অবস্থার বিপাকে পড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে।—ভদ্রলোকের কথায় সহানুভূতির রেশ ফুটে ওঠে বাস্তুচ্যুত অসহায় মানুষদের জন্যে।

নতুন ছাতা হারানোর শোক-চিন্তা তখনো কিলবিল করছিল সাধনের মাথায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ চমকে ওঠে সে নতুন আরোহীর কথার শেষাংশটুকু কানে যেতে।

অবস্থার বিপাকে পড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে, ব্যস্! অবস্থার বিপাকে পড়ে মরিয়া হয়ে অন্যায় করা অপরাধ নয় তাহলে। বেশ চমৎকার কথা!—হঠাৎ স্বগতোক্তির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায় সাধন। আবার সিগারেট টানতে শুরু করে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

অনন্ত ও দীপঙ্কর দুজনেই একই সঙ্গে পড়া থেকে মুখ তুলে একবার শুধু তাকায় সাধনের দিকে, তারপর আবার পড়ায় ডুবে যায়।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত। স্তালিনের স্থলাভিষিক্ত মালেনকফের জীবন-কথা অনেকদূর টেনে নিয়ে যায় তার মনকে। তারপর যেন অবসাদ নামে তার চোখে। আগের রাতে ঘুম হয়নি ভালো, হয়তো তারই জের।

পর পর কয়েকটা স্টেশনই পার হয়ে গেল। এর মধ্যে অনন্ত চোখ মেলে তাকিয়েছে দু একবার, কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখের দুপাতা আবার বুজে যায় ঘুমের যাদুস্পর্শে।

কুলি বাবু, কুলি! কুলি চাই!—শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেণ এসে থামতেই স্বাভাবিক হাঁক দিতে দিতে কুলিরা সব দলে দলে এক-একটা কামরায় উঠে পড়ে।

এই কুলি, এই কুলি!—অজস্র মানুষের ওঠানামার হল্লায় ও হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে যায় অনন্তর। আঁৎকে উঠে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে ট্রেণ এসে গেছে শিয়ালদায়। প্রথমকার সহযাত্রী দুজন তার আগেই নেমে গেছে, কিন্তু 'নিউ টাইমস্'খানা ভুলে ফেলে গেছেতো! পরের আরোহীরাও মালপত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছে। অনন্তও একটা কুলিকে কাছে ডেকে নেয় তার মোট নেবার জন্যে। কিন্তু তার জিনিসপত্রগুলো সব গেল কোথায়? সীট থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বাংকের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যায় অনন্ত।

আপকা মোট কীধার বাবু জল্‌দি বাতায়ে।—প্রশ্ন করে কুলি। অন্তত আরো একটা মোট ধবার আশা আছে তার।

আর মোট, কে নিয়ে সটকে পড়েছে কে জানে? বেডিং সুট্‌কেশ

খাবারের বাক্স কিছুইতো দেখছি না।—অবাক-বিস্ময়ে কামরার চারদিকে আর একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে অনন্ত।

বেডিং, সুট্‌কেশের কথা কি বললেন?—অপুর একজন যাত্রী ট্রেণ থেকে নেমে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন অনন্তকে।

আমার এ-সব জিনিসগুলো বাংকের ওপর রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন তো তার কোন হদিস পাচ্ছি না। এমনি করে এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে যে এতো সব মাল উধাও হয়ে যাবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

সে কি মশাই? আপনার পাশাপাশি যে দুই ভদ্রলোক বসেছিলেন তারাই তো ব্যারাকপুর স্টেশনে কুলি দিয়ে বাংক থেকে মালপত্রগুলো সব নামিয়ে নিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। কোন সন্দেহই তো হয়নি আমাদের কারুর।

অনন্ত নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর হাতের 'নিউ টাইমস্'খানা সাধন যে সীটে বসেছিল সেখানে ফেলে রেখে বেরিয়ে আসে কামরা থেকে শূন্য মন নিয়ে।

কুলিটা অন্য আর একটা মোট গিয়ে ধরেছে ততোক্ষণে।

নীলাম

এই দেখে লিন বাবু, রকম রকম নীলামের খেলা। যা ইচ্ছে তাই লিয়ে লিন, কাঁইচি ছুরি টর্চলাইট লিন।—হঠাৎ প্রতুলদের কামরায় ঢুকে বিচিত্র সুরে বক্তৃতা শুরু করে দেয় এক তরুণ হকার।

দিল্লী থেকে কোলকাতাগামী জনতা এক্সপ্রেসের এই গাড়িখানার বোধহয় এই একটি মাত্র কামরাতেই তিন-চতুর্থাংশ যাত্রী বাঙালী। বারজনের মধ্যে যে তিনজন অবাঙালী তাঁরা গয়াবাসী বিহারী। একসঙ্গে এতোজন বাঙালী পেয়ে হকার তার জানা ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই বক্তৃতা দেওয়া সমীচীন মনে করে। এ তার ব্যবসায়ী কৌশল।

এক নীলামে তিনচীজ বাবু। সস্তা দরে লিয়ে লিন বাবু! বোলুন আপনার যেমন মর্জি দর বলুন।—এক, এক করে সকল যাত্রীকেই কাঁচি, ছুরি, টর্চলাইটের নীলামের দর জিগ্যেস করে হকার।

প্রতুল এক টাকা দর বলতেই হকার সুর করে সেই দর হাঁকতে থাকে এক টাকা, এক টাকা। অমনি আর একজন সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজের মুখ প্রায় ঢেকে ফেলে। কি খেয়ালে বলে ফেললেন —একটাকা চার আনা।

একটাকা চার আনা, একটাকা চার আনা, একটাকা চার আনা। বোলুন আর কেউ বোলবেন কিছু?—আরো বেশি দর আশা করে হকার আবার জিগ্যেস করে যাত্রীদের।

পৌনে দো রুপেয়া।—অবাঙালী যাত্রীদের একজন লাফিয়ে উঠে একডাকেই বার আনা তুলে দেয়।

পৌনে দো রুপেয়া, পৌনে দো রুপেয়া, একটাকা বারো আনা। বোলুন আর্ কেউ কোন বোলবেন বোলুন।

আর কেউ কিছু বলছে না। তবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হকার একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করে ডাক তোলবার।

কোই নেই আর বোলবার? লেকিন এই দামে তো নীলাম নেহি হোবে। দেখুন বাবুজী, এই তিনো চীজকা দাম তো আউর বহুত বেশি আছে। —এই বলে হকার একজন বাঙালী বাবুর সামনে এনে কাঁচি, ছুরি ও টর্চলাইট যাচাই করে দেখতে বলে। ভদ্রলোক প্রত্যেকটি জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে সার্টিফিকেটও দেন এই বলে যে, না জিনিসগুলো নেহাত বাজে মাল নয়।

হকার তার সঙ্গী সহকারীকে ছুরি কাঁচি টর্চলাইট ফিরিয়ে দিয়ে একছড়া বোতাম, একখানি খাতা ও একটি রুমাল তুলে নেয় সহকারীর পুঁটলী থেকে। সবার ধারণা হয় আগের নীলামে মূল্যবান জিনিসের দাম তেমন ওঠেনি বলে এবার বোধ হয় সস্তা জিনিসের নীলাম ডাক হবে।

কিন্তু না, তাতো নয়। যে যেরকম বলেছে তার কাছ থেকে সে পরিমাণ টাকা নিয়ে পকেটে পুরে নেয় হকার। তারপর রুমালখানা হাতে করে তুলে ধরে এমন এক বক্তৃতা দেয় যে শুনে অবাক্ হতে হয় সবাইকে! শুধু বক্তৃতাই নয়, কার্যতই সে প্রমাণ করে দেয় যে, ট্রেণের কামরায় হলেও নীলাম ঠকের কারবার নয়। ঠিক ঠিক দামে পৌঁছে গেলেও সে ছুরি কাঁচি ও টর্চলাইট ছেড়ে দিতো। কিন্তু তা যখন পাওয়া গেল না, তখন প্রথম নীলাম বাতিল করে দিতে হোল তাকে। তাহলেও যারা নীলাম ডেকেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছামূলক একটা কিছু দিয়ে

খুশি করবার ব্যবস্থা করেছে হকার। এবং সে কথাটাই সে আগে বক্তৃতা দিয়ে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে।

হকার এক এক করে তার হাতের একছড়া বোতাম, একটি খাতা এবং রুমালখানা তিনজনকে দিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে দেয় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া টাকা। বোতাম ছড়া পায় প্রতুল, খাতাটি যায় আর একজন বাঙালী যাত্রীর কাছে এবং রুমালখানি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় অল্পবয়স্ক বিহারী তরুণ। মূল্য যাই হোক না কেন বিনে পয়সায় পাওয়া তো, কাজেই আনন্দ কম-বেশি সবারই হয়ে থাকবে বৈকি ?

তবে বিহারী ছেলেটির আনন্দ একটু বেশি হওয়ারই কথা। সে তার দাদা ও নতুন বৌদিকে নিয়ে দিল্লী থেকে গয়ায় চলেছে। বৌদিকে খুশি করবার জন্যে আগাগোড়াই সে খুব সচেষ্ট এবং সজাগ। নীলামে সবচেয়ে উঁচু ডাক দিয়ে আর সবার কাছে তো বটেই, বিশেষ করে বৌদির কাছেও তার ইজ্জত যে সে বাড়িয়ে নিয়েছে সে বিষয় কোন সন্দেহই নেই। তার ওপর আবার এই সিল্কের রুমাল লাভ ! সে কি কম কথা ? এরই মধ্যে রুমালখানি সে বৌদিকে উপহার দিয়ে কৃত-কৃতার্থ হয়েছে।

এইবার নয়া নীলাম বাবুজী ! দেখিয়ে প্লেয়িংকার্ড, শোপ কেশ, আউর গোগোল চশমা আছে। বহুৎ আচ্ছা, আচ্ছা জিনিস আছে। বোলিয়ে বাবু, ডাক বোলুন।

এক টাকা।—এবারও প্রতুলই ডাক শুরু করে। খুব তাড়াতাড়ি সে মনে মনে সবগুলো জিনিসের আনুমানিক দর কষে নেয়। শোপ কেশটা দেখতে ভারি খাসা। যদি ওটা স্টেনলেস টিনের তৈরি হয়ে থাকে তাহলে শুধু ওর দামই হতে পারে এক টাকার বেশি। তাস-

জোড়া যদিও তার কাছে অপ্রয়োজনীয় তাহলেও তারও তো একটা দাম আছে! চশমাটা হয়তো বা কিছুই নয়, তবুও খেলনা হিসাবে ওর দাম কমসে কম চারগণ্ডা পয়সা হতে পারে। কাজেই হিসেবি মানুষ হিসেবে একটাকা দর ডাকটা মোটেই যে খুব বেশি হয়নি, প্রতুল সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ।

আবার সেই পুরোনো সুরের ডাক।

হকার হাত নেড়ে নেড়ে সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখায় জিনিসগুলো। এ-কথাই বলতে চায় সে যে, একটাকা ডাকটি নিতান্তই কম এবং নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে এই মূল্যবান জিনিস কটি নেবার লোক অনেকই রয়েছে যাত্রীদের মধ্যে।

হকারের অনুমান এবং আহ্বান ব্যর্থ যায় না। পর পর দুজনই এক টাকা দু আনা এবং দেড় টাকা দর তুলে দেন দুনম্বর নীলামের। এদের মধ্যে একজন প্রতুলের সঙ্গী ধীরেন।

দেড় রুপেয়া, দেড় রুপেয়া, দেড় রুপেয়া। আর কোই ডাকবেন? বোলুন। —হকারের উৎসাহ বেড়ে যায় এবং সে অন্তত আর একটা ডাক আশা করে।

এতোক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েই চুপচাপ বসে ছিল বিহারী তরুণ। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তার বৌদির সঙ্গে দু'একটা কথাও বলছিল। হয়তো বা তা নিছক কথা নয়, পরামর্শ। তার দাদা বোধহয় একটু অন্যমনস্কভাবেই বাইরের দৃশ্য দেখছিল সে সময়। হঠাৎ দুনম্বর নীলামেও ছোট ভাইটির ডাক শুনে তার চমক ভাঙে। সে ফিরে তাকায় তার দিকে। ছোট ভাই এক টাকা দশ আনা দর তুলে দিয়েছে—সবচেয়ে বেশি দর দিয়েছে সে।

এক রুপেয়া দশ আনা, এক রুপেয়া দশ আনা, এক রুপেয়া দশ আনা।

আর কেউ ডাকছেন না দেখে এক, দুই, তিন—বলে ডাক বন্ধ ঘোষণা করে দেয় হকার এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জানিয়ে দেয় যে, নীলামের ডাকের দামে এবারেও ঐ তিনটি জিনিস সে ছাড়তে পারছে না। কারণ, তার আসল দাম নাকি অনেক বেশি।

তা হলেও হকার এবারেও কাউকেই অখুশি করে না। গতবারের চেয়েও একজন বেশি এবার নীলাম ডেকেছে, তা সত্ত্বেও সে ঠকাবার পাত্র নয়। তার সহকারীর থলে থেকে সে নিজ হাতেই একটি চিরুণী, লতা মুঙ্গেশকরের ছোট একখানি বাঁধানো ছবি, একখানা ছোট আয়না এবং একখানি পামলিভ সাবান এক এক করে তুলে নিয়ে দুনম্বরের নীলাম ডাকা যাত্রীদের পর পর দিয়ে যায়।

সবাই ভারি খুশি এই অকারণ পুরস্কার লাভে। এ-শুধু অকারণ নয়, আশাতীত প্রাপ্তিযোগ! বিহারী তরুণটি সাবানখানা বৌদির হাতে তুলে দিয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে একেবারে। ফাষ্ট প্রাইজটা তো সে-ই পেয়েছে। অর্থাৎ প্রাপ্তিটা সবার আগে তারই ঘটেছে কিনা,তাই ফাষ্ট!

রামরতন, তুমহারা নসিব তো বহুৎ জোর হ্যায়! ফিন আউর একঠো প্রাইজ মিল গ্যা? —বিহারী ছেলেটির দাদা এতোক্ষণ এ নীলামের দিকে বড়ো বিশেষ নজর দেয়নি। প্রথম বারের নীলামে ছোট ভাই-এর একখানি রুমাল লাভে সে খুশি হয়েছিল বটে, কিন্তু তাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয় বারের নীলাম শুরু হবার সময় থেকে সে প্রায় সবটুকু সময়ই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল—প্রাকৃতিক দৃশ্য কতোটা উপভোগ করছিল বলা কঠিন, তবে বেশির ভাগ সময়টাই যে নব-পরিণীতা স্ত্রী-সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হয়তো অন্য ব্যাপারেও মাথা ঘামাচ্ছিল তারই ফাঁকে ফাঁকে। কারণ দিল্লী থেকে ট্রেণ ছাড়ার পূর্ব

মুহূর্ত পর্যন্ত তার পিতাজী বারবার গদীর হিসেব-পত্তরটা প্রথম থেকে বুঝে নিতে বলছিলেন।

রামরতন কিন্তু অতো সব হিসেব-পত্তরের ধার ধারে না। সে তার বৌদিকে সস্তায় সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় মত্ত। পামলিভ সাবানই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাবান এটা প্রমাণ করতে তার খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সাবানখানা নিয়ে ঘোমটার নিচে নাকের কাছে ধরতেই ফিক্ করে হেসে ফেলে বৌদি। আর ঠিক সেই সময়েই রামরতনের দাদা মুখ ফিরিয়ে ভাইকে অভিনন্দন জানায় তার সৌভাগ্যের জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে কেমন যেন একটা খটকাও লাগে।

রামরতন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে না কি! বাইরের দিকে মুখ রেখে কান পেতে রামের দাদা বোধ হয় ওদের ফিসফাস কথা-বার্তাও দু'চারটে শুনছিল।

প্রতুল, ধীরেন, আর অমূল্যের মধ্যেও ঠিক ঐ একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন। বৌদিই যে রামরতনের সেরা নীলাম ডাকের ইন্সপিরেশন্ এ-কথা প্রতুল বেশ জোর দিয়েই বলে এবং ধীরেনও সায় দেয় তার কথায়। অমূল্যের মত অবশ্য অন্যরকম। সে বলে, এ-নেহাত ছেলেমানুষী উৎসাহ।

কিন্তু আসল ব্যাপার যাই হোক, রামরতনের দাদাকে কিন্তু বেশ একটু সতর্ক হতেই দেখা যায় সেই থেকে। তৃতীয়বারের নীলামের সময় শুরু থেকে শেষ অবধি সে প্রত্যেকটি ডাকই লক্ষ্য করে। একবারও আর জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরের হাওয়া খাওয়ার বা স্বভাব সৌন্দর্য উপভোগের কোন ইচ্ছে বা আগ্রহই লক্ষ্য করা যায়না তার।

এ বারই শেষ খেলা বাবুজী! নীলামের সব আচ্ছা আচ্ছা মাল

এবার খরিদ করে লিন বাবু।—এই বলে একছড়া রোল্ড গোল্ডের হার, একজোড়া কানপাশা, এক গজ লাল চুলের ফিতা এবং একটা রিষ্ট-ওয়াচের নিকেল ব্যাণ্ড তুলে ধরে নীলাম ডাকতে আহ্বান জানায় হকার।

আরে দূর, এ সবই তো দেখছি মেয়েদের জিনিস!

কেন, ঐ যে হাতঘড়ির ব্যাণ্ডটা রয়েছে! ওটা বুঝি চোখে পড়েনি আপনার?—পাশের অপরিচিত সহযাত্রী উত্তর দেয় প্রতুলের কথায়।

বেশ তাহলে দেওয়া যাক একটা ডাক।—এই বলে প্রতুল আগের হুবারের মতোই সবার আগে হকারের আহ্বানে সাড়া দেয়, কিন্তু তার ডাক সেই একটাকার ওপরে আর ওঠে না।

কি হে, তোমার আবার এ-সব গহনা-পত্তরের কি প্রয়োজন হলো? এবারেও ডাকছো! গৃহ আর গৃহিণীর তো বালাই নেই, কোন বান্ধবী-টান্ধবী আছে নাকি?—ঠাট্টা করে বলে অমূল্য।

না না, আমি চিন্তে করে দেখেছি, ঐ ফিতেটা আর ব্যাণ্ডটার দামই এক টাকা হতে পারে। ব্যাণ্ডটা নিজের হাতেই শোভা পাবে। ফিতেটা ভাইঝিকে দেওয়া যাবে। তারপর বাকি জিনিসগুলোর দাম যাই হোক না কেন সেগুলো খেলনা হিসেবে নিতে আমার আপত্তি নেই।

এদিকে প্রতুলের ডাকের ওপর আরো আট আনা দর তুলে দিয়েছে রামরতন। সে প্রথম দিকটায় একটু নীরব ছিল। হয়তো মনে মনে ভেবে দেখছিল এই গয়নাগুলোতে তার বৌদিকে কেমন মানাবে। দাদার সতর্ক দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে সে দেরি করছিল কিনা তাও অবশ্য ঠিক করে বলা যায় না। তবে ডাক দেবার আগে বৌদির ইঙ্গিত রামরতন নিশ্চয়ই হয়তো পেয়ে থাকবে। আর হুবার যেমনি হয়েছে এবারই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

দেড় রুপেয়া, দেড় রুপেয়া, দেড় রুপেয়া। আর কেউ বাবু ডাকবেন। বোলুন বাবুজী।

এক টাকা দশ আনা। এই যে প্রতুল তোমার যখন খেলনা নিতে আপত্তি নেই এবং ভাইঝির জন্যে চুলের ফিতে আর নিজের জন্যে ঘড়ির ব্যাণ্ডটার দিকে যখন তোমার লোভ রয়েছে, তখন একটা ডাক দিয়েই দিলাম, দেখা যাক কি হয়।—এই বলে প্রতুলকে হাসতে হাসতে একটা ঝাঁকুনি দেয় অমূল্য।

হকার তখন তার হাতের জিনিসগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জোর বক্তৃতা দিয়ে চলছিল। একথাটাই সে বোঝাতে চাইছিল যে, এ কামরার যাত্রীরা ভালো জিনিসের তারিফ করতে জানে না, কাজেই তাদের পক্ষে নীলামের মাল খরিদ করা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না!

এজন্যে রীতিমতো দুঃখ প্রকাশ করে হকার। এখুনি নীলামের ডাক শেষ করে দেবে সে। তাই আর একবার সে দেড় রুপেয়া, দেড় রুপেয়া বলে হাঁক দিয়ে দর তোলবার জন্যে যাত্রীদের আহ্বান জানায়।

এদিকে অমূল্য যে নেহাত ইয়ার্কি করে হলেও ইতিমধ্যে দুআনা ডাক তুলে দিয়েছে, সেদিকে খেয়ালই নেই হকারের। তার বক্তৃতার বকবকানির মধ্যে নিজেই সে ডুবে গিয়েছিল, অমূল্যের সামান্য ডাক তার কানে পৌছয়নি। বিশেষ করে তার আশার কাছাকাছি ডাক না পৌছানোয় একটু হতাশামিশ্রিত অস্থিরতাও দেখা দিয়েছিল হকার বেচারার!

রামরতন কিন্তু বেশ খুশি হয়েছে তার ডাকই শেষ ডাক হবে মনে করে। আরো দুআনা বাড়িয়ে সে আর একটা ডাক দেবে ভাবছিল মনে মনে। ঠিক এমনি সময় হকার তার ডাককেই শেষ ডাক বলে ঘোষণা করলে। এ ঘোষণায় রামরতন যে খুশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু রামরতনের সে আনন্দ স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ। হকারের বক্তৃতা থামতেই ধীরেন হঠাৎ বন্ধু অমূল্যের ডাকেরই পুনরুক্তি করে।

এক টাকা দশ আনা। বোলুন আর কে বোলবেন!

দু টাকা।—উত্তেজনার মুখে ডেকে ফেলে রামরতন।

এ্যা কেয়া হোতা হ্যায়, রতন?—রামরতনকে তার বাড়াবাড়ির জন্যে তিরস্কার করে তার দাদা।

আউর কোই ডাকনেবালা হ্যায়? আভি খতম হো যায়েগা খেলা।

দু রুপেয়া। আর কোই ডাকবেন বাবুজী?

দু টাকা দু আনা। খবরের কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে নিতান্তই আকস্মিকভাবে এক প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক কি খেয়ালে একটা ডাক দিয়ে বসলেন। রামরতনের মনটা এবার সত্যি খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর দাদার ধমক খেয়ে আগে থেকেই বেশ একটু দমে আছে বেচারা।

ট্রেনের হুইসিল বেজে উঠে। হুইসিলের একটানা বিকট শব্দে কানে তালা লাগে। ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কাছেই কোন বড়ো ষ্টেশন নিশ্চয়ই।

দু টাকা দু আনা দর তিন বার ঘোষণা করে হকার নীলামের খেলা শেষ করে দেয় প্রতুলদের কামরায়। যে যেমন দর ডেকেছে তার কাছ থেকে তেমনি পরিমাণ টাকা চেয়ে চেয়ে নেয় সে এক এক করে।

কী ব্যাপার, এবারও তা হলে কারুর ভাগ্যে সত্যিকারের নীলাম খরিদ সম্ভব হোল না? প্রতুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

কিন্তু এবারও যদি আগের দুবারের মতোই যার যার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সকলকে যাইহোক কিছু কিছু করে পুরস্কার বিলিয়ে চলে যেতে হয় হকারকে, তা হলে এ হুজ্জোতে কি প্রয়োজন বেচারীর এমনি জিজ্ঞাসা জাগে অমূল্যের মনে!

না, এবার তো টাকা ফেরত পেলে না কেউ। বরং শেষ নীলামের প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে তৈরি এক একটি সেট পুঁটলি থেকে বার করে নিয়ে হকার হাতে হাতে দিয়ে যায় প্রত্যেক ডাকদারকে এবং সকলেই বিস্মিত হয় তাতে।

আপনার ডাকটি আপনি কিন্তু বেশ চাপিয়ে দিলেন আমার ওপর।

সে কি কথা? আমি তো নেহাত ঠাট্টাচ্ছলেই একটা ডাক দিয়েছিলেম প্রতুলের সঙ্গে তামাসা করতে করতে। আর সে ডাক হকারের কানেও যায়নি। শেষ পর্যন্ত আপনিই তো এই হাঙ্গামাকে মাথা পেতে নিলেন আমায় সমর্থন করে এবং সে ডাক হকারের কানে তুলে দিয়ে। আর এখন দোষ চাপাচ্ছেন আমার ওপর। বেশ ভাই বেশ! ঠিক আছে, আমিই না হয় টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

ধীরেনের কথার উত্তরে এই বলে ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে যায় অমূল্য।

না, না, সে কি? টাকাও যেমন আমি দিয়েছি, নীলামের মালও তো আমিই নিয়েছি।—এই বলে ধীরেন বাধা দেয় অমূল্যকে। বোধহয় একটু লজ্জাও পেয়েছে সে অমূল্যের কথায়। মেয়েটা খেলার গয়না পেয়ে খুঁশিই হবে, এই বলে সে তার আগের কথাটা একরকম প্রত্যাহারই করে নেয়।

ইতিমধ্যে গাড়ি এসে পুরোপুরি থেমে গেছে এলাহাবাদ ষ্টেশনে। হকার তার সহকারীকে নিয়ে কখন যে উধাও হয়ে গেছে তা কেউ জানে না।

রামরতন তার পাওয়া গয়নাগুলো ততোক্ষণে তার বৌদিকে গছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দাদা পাছে আবার বাড়াবাড়ি বলে মনে করে, তাই বৌদির সঙ্গে মনখুলে এ নিয়ে তুটো কথা বলতেও পারছে না।

পরিচয়

পরিমল সেনের মামলা কোর্টে উঠেছে। আলিপুর কোর্টে।

সেনট্রাল জেলের খুব কাছাকাছি বলে এ কোর্টে আলিপুর জেল থেকে আসামীদের আনা-নেওয়া করার খুবই সুবিধে।

আসামীদের কিন্তু দূরে কোর্ট হওয়াটাই পছন্দ। মামলার দিনে একটু বেশিক্ষণ ধরে বেড়ানো চলে তা হলে।

সেনের মামলার কয়েকটা শুনানীও হয়ে গেছে এরই মধ্যে। কর্ণেল সিমসন, ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট, স্যার চার্লস টেগার্ট, রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র গুহ, মিঃ হার্টলি প্রভৃতি সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন। নির্মলেন্দু রায় আর তাঁর বন্ধু ভবেশ পাঠকের জবানবন্দী তো আগেই নেওয়া হয়েছে।

রায়ের দিন বেশ ভিড় জমে যায় কোর্টে। নির্মলেন্দুও পাঠককে নিয়ে উপস্থিত। নির্মলেন্দুর মেয়ে জবাও কোর্টে তাঁদের সঙ্গী। আব্দার ধরেছিল জবা সকাল থেকেই, বাবার সঙ্গে যাবে সে। তার কোর্ট দেখবার অত্যন্ত শখ, চোর-ডাকাত দেখবার শখ এবং কি করে বিচার হয় তাও জানবার খুবই ইচ্ছে। তাছাড়া যে সেন এতোবার এসেছে তাদের বাড়িতে তার পাঠক কাকার সঙ্গে, বন্দী হিসেবে তাকে কেমন মানায় তাও দেখবার তার ভারি আগ্রহ। অগত্যা বাপ তাকে না নিয়ে পারেন না সঙ্গে।

সরকারি কর্মচারীর স্বাক্ষর জাল ও প্রতারণার দায়ে সেনকে দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন হাকিম।

রায় শুনেই আসামীর কাঠগড়া থেকে সেন বলে ওঠে নির্মলেন্দুকে লক্ষ্য করে—দেখুন মিঃ রায় ঠিক বলেছিলাম কিনা। আমাদের

অভিজ্ঞতারও তো একটা মূল্য আছে। কী বলেন? দু বছর বলেছিলাম, ঠিক দু বছরই তো হলো! আমার জীবনে এবার ভাঁটা চলবে দু বছর ধরে। আবার জোয়ার আসবে। ভাববার কি আছে?

এই যে মিঃ পাঠক যে!—এবার পাঠকের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে সেন। আপনার কমিশনটা আর দেবার সুযোগ হলো না। আসলেই যে গোলমাল হয়ে গেল কিনা! তাই আপনার খাটা-খাটুনী সব বরবাদ হয়ে গেল। কী আর করবো বলুন! ক্রীক রো'র মেয়েটাই এবার পুরো ডুবিয়ে দিলে। তা না হলে আপনার পার্টনারশিপে ভালো ব্যবসাই করা যেতো।

কোর্ট ভর্তি লোক সেনের কথা শুনে অবাক্।

পুলিস হাতকড়া দিয়ে সেনকে নামিয়ে আনে কাঠগড়া থেকে। কোমরে দড়ি বেঁধে কোর্ট থেকে বার করে নিয়ে যাবার পথে সেনের চোখ পড়ে জবার দিকে।

আরে তুমিও এখানে! বাবার সঙ্গে এসেছ বুঝি? তা বেশ! ভারি মিষ্টি গান তুমি শুনিয়েছিলে সেদিন আমাদের।

আর বেশি কথা বলবার সুযোগ পায় না সেন। পুলিস তাড়া দেয়। ঠিক্ পিছনেই রয়েছেন নির্মলেন্দু আর পাঠক। পিছন ফিরে সেন দেখতে পায় ওদের।

আর একটা কথা বলার ছিল সেনের। জরুরী কথা। তার মনের কথা। সুযোগ পেয়ে সে বলে ফেলে।

শুনুন মিঃ রায়, আপনার কথাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে। আমার পথটাই হয়ত বাধ্য হয়ে বদলাতে হবে এবার।

সেতো ভালো কথা।— রায় খুশি হয়েই উত্তর দেন।

খুব ভালো কথা নয় মিঃ রায়।· সব ভুলেটুলে বেশ ছিলাম। কিন্তু আর তো বোধহয় থাকা চলবে না।

কী হয়েছে তাই বলুন না।—পাঠকের মুখ খোলে এবার।

কী আর হবে, গোড়ায়ই ধরা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। মেদিনীপুর জেল থেকে একদল সত্যাগ্রহী বন্দীকে বদলী করে আনা হয়েছে আলিপুর জেলে। সকাল বেলা তাদের নিয়ে সে কী হল্লা জেল গেটে! প্রিজন্ ভ্যান্ থেকে বন্দীদের, আর বাইরে জনসাধারণের "বন্দেমাতরম" আর "ভারত মাতা কী জয়" ধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল চারিদিক।

তারপর ?—জানতে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন পাঠক।

আমাদের কজন আসামীকে তখন কোর্টে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। সত্যাগ্রহী বন্দীদের জেল গেট পার করে ভেতরে আনা হলো সে সময়। ওঁরা আসছেন তাই এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের। আমার চোখ পড়ল সত্যাগ্রহী দলের ওপর। দলের সামনে একজন প্রৌঢ়া মহিলা। হিন্দু বিধবা। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখার আলো ঝলমল করছিল তাঁর চোখে-মুখে। পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করছিলাম তাঁর দৃষ্টিতে। সঙ্গে তাঁর একটি তরুণী। বছর চৌদ্দ পনরো হবে তার বয়েস। ওই মহিলারই মেয়ে বলে মনে হলো আমার।

আবার কী হলো ? সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প আরম্ভ করে দিলেন যে! চলুন মিঃ রায়, গাড়িতে বসেই না হয় কথা বলবেন।—মিঃ বর্মণ ছুটতে ছুটতে ওপর থেকে নেমে এসে আবার তাড়া দেন পুলিসের লোকদের। মিঃ রায়কে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে ভদ্রতা রক্ষা করেন।

রায় কথা বলছিলেন বলেই পুলিস একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ভারি ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার মিঃ বর্মণ! শুনুন আপনার কয়েদী কি বলছে। হ্যাঁ বলুন তো, তারপর কী হলো। ওদের কি আপনার জানাশোনা কেউ বলে মনে হলো?—জিগ্যেস করলেন রায়।

হ্যাঁ, তেমনিই তো সন্দেহ হলো। কোর্টে যাবার পথে জেল ইন্সপেক্টরকে গাড়িতে জিগ্যেস করে জানলাম, ফরিদপুর কোটালিপাড়ার সত্যাগ্রহী দল এঁরা। কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে দণ্ডিত হয়েছেন। শুনে সন্দেহ আরো পাকা হলো।

কী সন্দেহ করছেন আপনি?—পাঠক জানতে চান।

ভদ্রমহিলাকে মনে হচ্ছে মৃণালিনী দেবী বলে। আর মেয়েটি খুব সম্ভব তাঁরই কন্যা সুধীরা সেন।

আপনার কেউ হন বুঝি তাঁরা?—রায় প্রশ্ন করেন।

পরিষ্কার করেই বলে ফেলি তা হলে। মৃণালিনী দেবী আমার স্ত্রী। আর তাঁরই কন্যা শ্রীমতী সুধীরা। প্রায় মাস খানেক আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম, মৃণালিনী দেবীর নেতৃত্বে নিজ কন্যা শ্রীমতী সুধীরা সহ তেরো জনের একটি সত্যাগ্রহী দল কাঁথি যাত্রা করেছেন লবণ আইন অমান্য করার জন্যে। কাঁথিতে তাঁরা ধৃত ও দণ্ডিত হয়েছেন সে খবরও কাগজে পড়েছি। কিন্তু এ আমি ভাবতে পারিনি যে, আমি যে জেলের কয়েদী সে জেলেই মৃণালিনী দেবীও কোনদিন সকন্যা এসে হাজির হবেন।

এ কী বলছেন মিঃ সেন, আপনি বিবাহিত? একটি কন্যাও রয়েছে আপনার? আবার বলছেন সত্যাগ্রহী নেত্রী আপনার স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে আপনি বিধবার বেশে দেখেছেন! এসব কথার কী অর্থ কিছুই তো বুঝতে পারছিনা।

নিচে নেমে এসে প্রিজন্ ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আর এক দফা আলাপ করতে করতে সেনের কথায় যেন দিশেহারা হয়ে

যান নির্মলেন্দু। পাঠকের দিকে চেয়ে দেখেন, তাঁরও দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ছাপ।

একটু বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে আর অসুবিধা হবেনা মিঃ রায়। কোন বন্ধুর বেনামীতে প্রশান্ত সেন যদি নিজের মৃত্যুর খবর তার করে নিজের স্ত্রীকে জানিয়ে দেয়, আর এভাবে সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে পরিমল সেন নাম নিয়ে জেলপাখি বনে যায়, তাহলে প্রশান্ত সেনের স্ত্রীর পক্ষে বিধবা না হয়ে আর উপায় কি?

আসলে আপনি প্রশান্ত সেন তাহলে?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন রায়। এভাবে নাম পাল্টে নিয়ে নিজের স্ত্রীকে প্রতারণা করতেও একটু বাধল না আপনার?—পাঠকের জিজ্ঞাসায় একটা বিতৃষ্ণার সুর ফুটে ওঠে।

প্রশান্ত সেনেরই বা কি আর করার ছিল? ১৯১০-এ এণ্ট্রান্স পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই পিসির পাল্লায় পড়ে বিয়ে করতে হলো তাকে। জ্যোতিষের বাক্যে পরম ভরসা পিসির। রাজ-রাজেশ্বর হবে তার মা-বাপ-মরা ভাইপো, দেশের দশজনের একজন হবে। শ্বশুরের টাকায় বি-এ অবধি লেখাপড়াও করলে প্রশান্ত। কিন্তু পরীক্ষাটি আর দিলে না। শরীর খারাপ এই অজুহাত দিলে। পিসির বাড়িতে মাসের পর মাস বছরের পর বছর বেশ আরামেই গড়িয়ে যেতে লাগল। বৌও তখন পিসির বাড়িতেই।

বিয়ের আট-ন বছর পর একটি কন্যা লাভ হলো প্রশান্তর। নিজে শখ করে মেয়ের নাম রাখল সুধীরা। বছর না ঘুরতেই মৃণালিনীর কথায় বেশ একটু ধাক্কা খেলে প্রশান্ত।

ঠিকই তো, বসে বসে খেয়ে পিসির সম্পত্তি তো প্রায় নিঃশেষ। মেয়েটা বড়ো হবে, তার ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, মৃণালিনীর সব কথাই তো ঠিক। অর্থ উপার্জনে এবার আর না বেরুলেই নয়।

প্রশান্ত বেরিয়ে পড়ে। জ্যোতিষের বাক্য বেদবাক্য। পিসিমার বিশ্বাস কি মিথ্যে হতে পারে? দশজনের একজন তাকে হতেই হবে। কিন্তু চূড়ান্ত ঘোরাঘুরি করেও চাকরি-বাকরি জোটে না তার অদৃষ্টে।

অগত্যা সেন ব্যবসা আরম্ভ করে। নিতান্ত অনিচ্ছায়, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। বাঙালীর ছেলে ব্যবসাকে কোনদিন ভালো চোখে দেখে না। চাকরি-বাকরি নেহাত না পেলেই এপথে পা বাড়ায় বাঙালী। প্রশান্তর বেলায়ও ঠিক তাই। চাকরির চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিফল ও বিরক্ত হয়েই সে ব্যবসায়ের পথে আসে।

বিনা মূলধনের ব্যবসা। তা হলেও বড়ো দায়িত্বপূর্ণ। তবে বেশ কিছুকাল বিনা ঝামেলায় এ ব্যবসা সে চালিয়ে যায়। বাড়িতে টাকাও পাঠায় মাসে মাসে। পিসিমার কাছে গিয়ে একবার ঘুরেও এসেছে এরই মধ্যে। ব্যবসায়ের একটি অংশীদার বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল সে। রীতিমতো খরচপত্র করে এসেছে। বৌ-মেয়েও যে সেখানে!

কৃতী ভাইপোর মহিমা প্রচারে পিসির যে কী উন্মাদনা সেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে এসেছে সেবার। কথায় কথায় জ্যোতিষের বাণী শুনিয়ে দেন পিসিমা যাকে সামনে পান তাকেই। এমনি অবস্থা।

এদিকে কোলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন বাদেই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে। দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের বিপদ! যে কোন সময়েই তা ঘটাতে পারে। প্রশান্ত ধরা পড়ে যায়। পুলিসের কাছে পরিচয় দেয় সে পরিমল সেন বলে। তিনমাস জেল হয়ে যায় তার। সেই তার প্রথম জেল। পূর্ব ব্যবস্থামতো সেনের ঐ অংশীদার বন্ধু তার করে মৃণালিনী দেবীকে জানিয়ে দেয় প্রশান্তর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ।

কী সাংঘাতিক ব্যাপার!—বর্মণ সায়েব সুদ্ধু সবাই চমকে ওঠেন

সেনের কথা শুনে। এতোক্ষণ একমনে শুনছিলেন তাঁরা সেনের কথা। কিন্তু রায় আর চেপে রাখতে পারেন না তাঁর বিস্ময়।

কিছুই সাংঘাতিক নয় মিঃ রায়। ঈশ্বর প্রশান্ত সেনের অভূতপূর্ব প্রতিনিধি এই পরিমল সেন চৌদ্দটি বছর মোটামুটি বেশ ভালো ভাবেই তো কাটিয়ে দিলে। কিন্তু সে সুখ আর বোধহয় তার কপালে সইলো না। পুলিসের হাতে অনেক বার সে ধরা পড়েছে, তবে সে-সব ধরা পড়াকে কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই সে আনেনি কোনদিন। কিন্তু এবার যে মৃণালিনী দেবীর হাতেই তাকে পাকাপাকি ভাবে ধরা পড়ে যেতে হবে সে ভয়েই সে অস্থির।

সে আবার কিসের ভয়?—অবাক্ লাগে নির্মলেন্দুর।

ও, তা জানেন না বুঝি! স্বদেশী বন্দীদের সেবার ভার দেওয়া হয় 'ফালতু'দের ওপর। দু-চার বছরের জন্যে দণ্ডিত কয়েদী তারা সবাই। সে হিসাবে আমিও তাই। তাই ভাবছি, যে দুঃসময় আমার পড়েছে তাতে জেল-কর্তারা বেছে বেছে আবার আমাকেই মৃণালিনী দেবী আর সুধীরার সেবায় নিযুক্ত না করে বসেন! তা হলেই তো একেবারে সোনায় সোহাগা।

বেশ তো, সে তো ভালো কথাই।

ভালো কথা বলছেন? কিন্তু আপনার কথাই না জানি শেষ পর্যন্ত ফলে যায় মিঃ রায়, সেই ভয়।

নিন, চলুন এবার, উঠে বসুন গাড়িতে। দুটো বছর তো আবার জেল-ঘানিতে ঘুরে নিন, তারপর দেখা যাবে। বর্মণ এই বলে ঠেলে উঠিয়ে দেন সেনকে প্রিজন্ ভ্যানে, রায় এবং পাঠককে নমস্কার জানিয়ে নিজেও উঠে পড়েন। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ওরা তিনজন ওই গাড়ির দিকেই চেয়ে আছেন। সেনের কথাই শুনছেন যেন। তখনো শেষ হয়নি সে গল্প।

ডবলিউ ডি

নাম ?

শ্রীহনুমান চৌবে।

চার রুপিয়া।

দুনম্বর আসামী লোকনাথ রাউৎ হাজির ?

খুব নিকট হইতেই কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ায় এক গোবেচারা মানুষ। মুখে একগাল পান। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া। চুলে তেলের পরিমাণ এত বেশি যে লোকটিকে বাঙালী বলিয়া ভুল করিবার কারণ নাই। চোখে-মুখে যেন একটা গুরুতর অপরাধের ছাপ।

নাম ?

লোকনাথ রাউৎ।

বাড়ি ?

বালেশ্বর জেলা।

তিন টাকা।

হুজুর, আপন মতে ক্ষেমা দিয়ন্তু। মু আউ কৌদিন রাস্তায় পিশাপ করিব না। মু গরীব লোক মতে ছাড়ি দিয়ন্তু। মু টঙ্কা দেই পারিব নাহি, বাবু।

নিকালো হিয়াঁসে।

পেশকারবাবুর মুখের কথা সবটা বাহির হইতে না হইতেই আসামীর কাঠগড়ায় প্রবেশ-মুখে দাঁড়ানো লালপাগড়ির লোকটি লোকনাথের ডান হাত ধরিয়া এমন এক হ্যাঁচকা টান মারে যে, বেচারা পায়ের তাল ঠিক রাখিতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া

যায়। সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নাই কোন। বিচারপর্ব যথারীতি অতি দ্রুতগতিতেই আগাইয়া চলিয়াছে।

সাঁইত্রিশ নম্বর আসামী নীলাম্বর ধোবী হাজির?

এই যে স্যার।—এক পাশ হইতে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর আসে।

কালোমতো বেঁটে বাঙালী। ব্যবসায়ে ধোবী। দুই-চারি অক্ষর ইংরাজিও বলিতে কহিতে হয় তাহাকে—সাহেব-সুবাদের, বড় বড় অফিসার বাবুদের কাজ বুঝিয়া নিতে হয়, আবার বুঝাইয়া দিতে হয় তাহার। কাজেই এক-আধটুকু ইংরাজি না বুঝিলে ও বুঝাইতে না পারিলে চলিবে কেন?

কিন্তু ইংরাজি জানিলে এবং 'স্যার' বলিয়া সম্মান-সম্বোধন করিলে কি হইবে—কাঠগড়ায় যাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই পেশকারের দিক হইতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবাণ আসে এমন সুকঠোর ভাষায় যে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যায়, এমন কি 'গুডমর্ণিং' বলিবারও ফুরসত পায় না; অথচ সারাক্ষণ ধরিয়া শুধু এই কথাই সে ভাবিয়া আসিতেছিল যে, রাজভাষার সাহায্যেই সে বাজীমাৎ করিবে এবং সসম্মানে খালাস হইয়া আসিতে পারিবে।

নাম?

নীলাম্বর!—থতমত খাইয়া কোনরকমে জবাব দেয় আসামী।

আধমরা গাধাটাকে কেন মারলে ওরকম করে?

মারিনি তো, স্যার!

দশ টাকা।

আসামী কিছু বলিতে উদ্যত হইলেই কড়া নির্দেশ আসে পেশ-কারের আসন হইতে—

যাও!

তাহার উপর আবার পুলিসের চোখ রাঙানি। নীলাম্বর চতুর

ব্যক্তি। বেগতিক বুঝিয়া সে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া কাঠগড়া হইতে বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া পড়ে। শহরতলীর লোক হইলেও শহুরে লোকদের মেজাজ নীলাম্বর ভালো করিয়াই জানে। কারণ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ তো তাহার ঘনিষ্ঠই। তবে দশ টাকা, বড্ড বেশি!

বড়ো বিদ্বান বেটা আমার! হাকিমের মুখের ওপর কথা।—রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক বৃদ্ধ গর্জন করিয়া উঠে ভিড়ের মধ্য হইতে।

পাশের লোকজন তাহাকে বসাইয়া দেয় হাত টানিয়া। কিন্তু 'শিক্ষিত' পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া অলক্ষ্যে বৃদ্ধ পিতার তিরস্কারবর্ষণ নিবৃত্ত হয় না।

গোরু-গাধা মেরে কে কবে দু-তিন টাকার বেশি খেসারত দিয়েছে, শুনি? তিনি গেলেন ওস্তাদি করে ইংরাজি বিদ্যে ফলাতে। নাও এবার বোঝ ঠ্যালা, ফেল দশ টাকা!

চুপ, চুপ, চুপ!—বুড়োকে থামাইয়া দেয় সকলে মিলিয়া। কিন্তু উত্তেজনা তাহার তবুও প্রশমিত হয় না।

ইতিমধ্যে আরও দুইটি মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তবে নীলাম্বরের পিতা আদালত-কক্ষে যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল অনেকে তাহাতেই মশগুল ছিল, বিচার বা বিচার-প্রহসনের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না।

বছর-পঁচিশ আগের কথা। রোজকার মতো সেদিনও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-কক্ষ লোকে লোকারণ্য। আসামীদের ভিড়ে ঘাড় ঘুরাইয়া কথা বলাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আদালতে সকলের দৃষ্টি প্রধানত আকৃষ্ট রহিয়াছে দুইজনের দিকে

—সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হাকিম অর্থাৎ অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় এবং একটু নিচে বৃহত্তম টেবিলের সম্মুখে পেশকার মহাশয়ের প্রতি। দ্বিতীয়ত আর যাহারা আদালতে উপস্থিত কাহারও চোখ এড়ায় না তাহারা হইল বিচারালয়ের তিনটি 'স্ট্র্যাটিজিক পয়েন্টে' দণ্ডায়মান তিনজন লালপাগড়ি কনেস্টবল।

হাকিম মহোদয় অনেকটা নৈবেদ্যের উপরকার চিনির মণ্ডার মতো। লম্বা ছিপছিপে ভদ্রলোক বিজ্ঞজনের মতো চুপচাপ তাঁহার উচ্চাসনে বসিয়া আছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সাহেবী। আদব-কায়দা সাহেবদের ব্যর্থ অনুকরণ। এক-একবার বুকপকেট হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া কারণে বা অকারণে লম্বা ফুলস্কেপ কাগজের উপর কি যে লিখিয়া যাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে পেশকারের সঙ্গে কি যে কথা বলিতেছেন তিনিই জানেন।

বিচারকার্যে ব্যস্ততা যাহা কিছু পেশকার মহাশয়ের। পেশকারের প্রতাপে সবাই সন্ত্রস্ত। আসামীদের নম্বর ধরিয়া ডাকেনও তিনি, হাকিমের হইয়া সরাসরি রায়ও দেন তিনিই। মুহূর্ত মাত্র সময়ও নষ্ট করিবার উপায় নাই তাঁহার। প্রতি দুই মিনিটে এক একটি মামলার নিষ্পত্তি না করিলেই নয়। দৈনিক আড়াই শত হইতে তিন শত 'কেস' করিতে হয় তাঁহাকে। বেশি 'কেস' থাকিলে আরো তাড়া পড়ে। কারণ, পরের দিনের জন্য কোন 'কেস' ফেলিয়া রাখিলে দায় বাড়িয়াই চলিবে। সে ভয়ও বড়ো কম নয়। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট আয়ের জন্য দৈনিক নির্দিষ্ট-সংখ্যক মামলার ফয়সালা করিতে না পারিলে জরিমানার অঙ্ক বাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু পেশকারের তাহা পছন্দ নয়, কারণ বেশি জরিমানার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার মনে মাঝে মাঝে আশঙ্কাও উঁকি-ঝুঁকি মারে। তবে যেদিন 'কেস' নিতান্তই কম থাকে সেদিন দণ্ডের মাত্রা কিছু কিছু

না বাড়াইয়া পারেন না 'দণ্ডপাণি' পেশকার মহাশয়। কারণ, তাহা না হইলে বাঁধা আয় আসিবে কোথা হইতে? হিসাবে ভুল হইবার জো-টি নাই।

বাহান্ন নম্বর আসামী মোহন মিঞা হাজির?

পিছন হইতে অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে আগাইয়া আসে একজন নিরীহ গ্রাম্য মুসলমান।

নাম?

মোহন মিঞা।

পিতার নাম?

কাদির মিঞা।

পাঁচ টাকা।

মোহন কাঁদিয়া ফেলে রায় শুনিয়া। তবে কি বাপের নাম বলিয়া অন্যায় করিল সে? তাহার একটা কথাও শুনিলেন না হাকিম? কিন্তু কে কাহার আফসোসের ধার ধারে? তাহার চোখের জল কনেষ্টবলের শুষ্ক মরুমনে কিঞ্চিৎ দয়া বা সহানুভূতির সঞ্চার করিবে এরূপ আশা করাও যে নিতান্ত দুরাশা, মোহন মিঞার তাহা জানা থাকার কথা নয়। তাই পশ্চাতে দণ্ডায়মান পুলিসপুঙ্গবের আচমকা টানে ও ঘাড় ধরিয়া বাহিরের দিকে যথারীতি ধাক্কায় তাহার মোহভঙ্গ হইল বটে, তবে শাসন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের এই ব্যবহারে তাহার বিস্ময় ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না।

নিত্যকার মতো গড়িয়া গ্রাম হইতে সবজি লইয়া আসিতেছিল মোহন শিয়ালদহের বাজারে। সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গোরুর গাড়ির তলাকার লণ্ঠনটার আলো সে জ্বালাইয়া লইয়াছিল সন্ধ্যা হইবার আগেই। মোহন আইনজ্ঞ না হইলেও এই

আইন তাহার ভালো করিয়াই জানা আছে যে, শহরে সূর্যাস্তের পর আলো ছাড়া গাড়ি চালানো চলে না। এই তথ্য জানার জন্যে তাহাকে কোন বহি-কেতাবও পড়িতে হয় নাই বা কাহারও নিকট হইতে কোন পাঠও লইতে হয় নাই। আপনা হইতে এই অমূল্য জ্ঞান সে কবে কিভাবে শুধু আহরণই করিয়া লয় নাই, বিশেষভাবে আয়ত্তও করিয়া লইয়াছে। কাজেই আইনভঙ্গের অপরাধ না হয় সে সম্পর্কে স্বাভাবিক সতর্কতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না তাহার দিক হইতে। অথচ নসিবের দোষে কোথা হইতে অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া কখন যে গাড়ির বাতিটা নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে, মোহন তাহার কোন কিছুই জানে না। একটু আগেও সে একবার ঘাড় কাত করিয়া দেখিয়া লইয়াছে যে, লণ্ঠনের আলো ঠিকমত জ্বলিতেছে কিনা। দেখিয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। শিয়ালদহের বাজার আর দুই-তিন মিনিটের পথ। এইটুকু সময়ের মধ্যে আবার কোন হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে এমন সন্দেহ মোহনের ধারণার বাইরে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে অকস্মাৎ একটা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া যে বিপদ বাধাইয়া দিয়া গিয়াছে, মোহন তাহার কোন হদিস না পাইলেও তাহা কিন্তু পুলিসের চোখ এড়ায় নাই। পুলিসও ঝড়ের বেগে আসিয়া মোহনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। নাম ঠিকানা আর গাড়ির লাইসেন্স নম্বর নোট বইয়ে টুকিয়া লইয়া সে-রাত্রির জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও মোহনের উপর পুলিসের নির্দেশ, পরদিনই তাহাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে।

পুলিসের সেই হুকুম তামিল করিতে সে আদালতে আসিয়াছিল। কিন্তু আদালতে তাহাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তবে বিচারের যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিল সেখানে, তাহা

আর জীবনে ভুল হইবার নয়। সব খরচ-খরচা বাদ দিয়া সবজি বিক্রয় করিয়া পুরা দুই টাকাও সে লাভ করিতে পারে নাই। অথচ বিনা দোষে কোর্টে তাহাকে আক্কেল-সেলামি দিয়া যাইতে হইল পুরাপুরি তিন টাকা! মোহনের পক্ষে ইহা সত্যই মর্মান্তিক।

বিচারের এই সব গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আদালত-গৃহের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক বড়োই ছটফট শুরু করিয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোকটি যে একজন বিশিষ্ট মানী ব্যক্তি, তাঁহার শিষ্ট ব্যবহার ও অনাড়ম্বর সাজসজ্জা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি দেখিয়া আশপাশের সকলেই অবাক্ হইয়া ভাবে যে, কী এমন ব্যাপার যাহার জন্য ভদ্রলোক এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। মানীর অপমান বজ্রাঘাততুল্য। বিচারে কেহই যেখানে খালাস পাইতেছে না সেই আদালতের তিনি আসামী, এই তাঁহার ভাবনা।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকিলেও তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না বলিয়াই কেহই বড়ো একটা উকীল নিয়োগ করে না অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে, ভদ্রলোকের তাহা জানাই ছিল। তবে বিচারের যে নমুনা তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ করিলেন সে অভিজ্ঞতা তাঁহার সম্পূর্ণ নতুন। কাজেই একজন উকীলের আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন তিনি এই বিষয়ে এবং একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই 'গাছতলায় বসা' উকীলের সন্ধান করিতে যিনি কোর্টের ফটক হইতেই তাঁহাদের পিছন লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের অনিবার্য ফল সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য চেষ্টার আর কিছু বাকি রাখেন

নাই। সেই উকীল বেচারার এমনই বিকট চেহারা যে, তাঁহার দ্বারা যে কোন মামলা পরিচালনার কাজ চলিতে পারে, ভদ্রলোক তখন তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কয়েকজন আসিয়া লম্বা সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছে যে, আইনের মারপ্যাঁচ তাঁহার মতো বুঝিতে পারে এমন উকীল নাকি এই আদালতে আর নাই। ভদ্রলোক জানিতেন না যে, সার্টিফিকেট-দাতারা সবাই সেই উকীলেরই টাউট, বকশিশের উপরে দিন চলে তাহাদের, উকীলদের 'কেস' যোগাড় করিয়া দেয় তাহারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদ্য পরিচিত উকীলটি আসিয়া উপস্থিত। হাসির স্বকীয়তায় নিকটস্থ সকলকে চমকাইয়া দিয়া তিনি বলেন—

কি মশাই, প্রথমেই বলেছিলাম না যে, নাস্তি গতিরন্যথা? তখন তো গায়ে মাখেননি আমার কথা। এখানকার হালচাল দেখে এতোক্ষণে টনক নড়ল বুঝি? অথচ আগে থেকে আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিলে কতো কাজ এগিয়ে যেতো বলুন তো! যাকগে, যা হবার হয়েছে। এখন শুনুন কথা।

বলুন।

একটু পিছনে মুখ ফিরাইয়া উকীলবাবু আবার বলেন—

অনেক কাজ মশাই। এই আমার মুহুরী সখারাম। একে অনেক দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। দিন তো একে একটা টাকা। দরখাস্তের কাগজ আনতে হবে এক্ষুণি। তার জন্যেও আরো আট আনা দিয়ে দিন, আর এক প্যাকেট সিগারেটের পয়সা।

এই নিন।—বলিয়া ভদ্রলোক দুইটি টাকাই বাহির করিয়া দেন সখারামের হাতে।

সখারাম হাত পাতিয়া টাকা লইলে হইবে কি, প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখেন উকীলবাবু কর গুণিয়া গুণিয়া।

ছ্যাখো সখারাম, পা'ও তো 'গোল্ডফ্লেক' আনবে—বাজে সিগারেট আনবে না। আজেবাজে জিনিস আমি বরদাস্ত করতে পারিনে, বাবা!—প্রকারান্তরে ইহা যে সখারামের উপর সিগারেটের জন্য 'বাজে' পয়সা খরচ না করারই নির্দেশ তাহা একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই বুঝিল না বটে, তবে উকীলবাবুর পরবর্তী কথাবার্তা ও আচরণে বুদ্ধিমান লোকের মনে একটা কিছু সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া কোর্টের ফটকে তাঁহাকে প্রথমে তো সানন্দে বিড়ি ফুঁকিতেই দেখা গিয়াছিল!

সখারাম বাহির হইয়া যাইতে না যাইতেই উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার মক্কেলকে—

কি মশাই, সিগারেট ফিগারেট আছে কিছু?

না, পানদোষ তো নেই আমার। আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। এই যে জীবানী, তুমি তো কম্পিটিশনে ধূমপান করো। দাও না একটা সিগারেট উকীলবাবুকে।

জীবানীতোষ ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার অন্যতম সঙ্গী হিসাবে আসিয়াছেন আদালতে। বন্ধুর কথায় তাড়াতাড়ি পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বাক্স বাহির করিয়া দেন উকীলকে।

উকীলবাবু ধন্যবাদ জানাইয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আবার প্রশ্ন করেন মক্কেলকে—

আচ্ছা, মশাইয়ের নামটা জানা হলো না!

শ্রীহিমাংশু সেন। আপনার নাম?

শ্রীনিশাপতি ভট্চায বি. এল.। তবে এ অঞ্চলে নিশাপতি বলেই পরিচিত। এক ডাকেই চেনে সবাই। 'পেটি কেসে'র ঝঞ্ঝাট অনেক মশাই। সাহস করে আর কোন উকীলই এ সব 'কেস'

বড় একটা নিতে চায় না তাই সবাই ডাকে এই নিশাপতিকে।—নাস্তি গতিরন্যথা!

আপনি তো কেবল নিজের কথাই বলছেন নিশাপতিবাবু। আমার কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সারুন। একশ' বাহাত্তর নম্বর আমার। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশটি নাম বাকি। যেরকম বাদ দিয়ে দিয়ে নম্বর ডাকা হচ্ছে, তাতে আর কতটুকু সময় পাওয়া যাবে?

না, না মশাই, সে ভয় কিছু করতে হবে না আপনাকে। এখন আর কোন নম্বর বাদ পড়বে না, নম্বর বাদ পড়ে আগের দিকেই। প্রথমদিকে অনেকেরই কোর্টে হাজির হতে অসুবিধা হয়। তাদের অনেকেই শেষ অঙ্কে এসে উপস্থিত হবে। সবই টাকার খেলা। কাজেই সে বিষয়ে ভাবনা নেই আপনার। ঐ যে সখারাম কাগজ-পত্র নিয়ে আসছে। দিন্ দেখি তুটো টাকা—আমি এ ফাঁকে আসল কাজটা সেরে আসি।

তুইটি টাকা লইয়া নিশাপতি বাতাসের বেগে কোথায় গেলেন এবং চক্ষের নিমেষে কোথা হইতে কি কাজ সারিয়া আসিলেন তিনিই জানেন। আসিয়াই সখারামের হাত হইতে ফাইলটা টানিয়া লইয়া হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে করিয়া বারান্দায় আসিলেন এবং সখারামকে বলিয়া দিলেন নাম ডাকের দিকে কান রাখিতে।

বারান্দায় লম্বা বেঞ্চির উপর বসিয়া ফাইল খুলিয়া নিশাপতি জিজ্ঞাসা করেন হিমাংশুবাবুকে ঘটনার বিবরণটা এবং পকেট হইতে একটা পেন্সিল বাহির করিয়া অতি দ্রুত লিখিয়া চলেন এক দরখাস্ত। কিন্তু লেখার দৌড় অর্ধ মিনিটের মধ্যেই থামিয়া যায়।

হ্যাঁ, বলে যান ব্যাপারটা।

তুই-চারি অক্ষর লিখিয়া নিশাপতি আবার জিজ্ঞাসা করেন সেই একই প্রশ্ন।

দুবার করেই তো শুনলেন ঘটনার বিবরণ, আবার নতুন করে কি বলব, বলুন তো ? এদিকে যে সময় শেষ হয়ে এলো। যা হয় তাড়াতাড়ি লিখে নিয়ে চলুন ভিতরে।

মক্কেলের বিরক্তি দেখিয়া নিশাপতি আবেদন-পত্রে কোন রকমে আর কয়েকটি লাইন লিখিয়া বলেন—

এই নিন্, দিন এখানে একটা সই, আর আমার ফী-টা।

হিমাংশুবাবু দরখাস্তখানা হাতে লইয়া খানিকটা পড়িয়াই তাতে সই দিতে আপত্তি জানাইয়া বলেন উকীলবাবুকে যে, আবেদনের লেখা এমনই ত্রুটি ও ভ্রান্তিপূর্ণ যে, তাহা হাকিমের নিকট পেশ করা চলে না।

কি বলেন মশাই ! আজ বার বছর কেটে গেল এখানে এ কাজ করে। আর আপনি শেখাবেন আমাকে কোন্টা ঠিক কোন্টা অঠিক ? কোন্ হাকিম কি ধরনের ইংরাজি ভাল বুঝবে তা আপনি জানবেন কি করে ? আমাদের জানা আছে সে সব। এর চেয়ে ভাল ইংরাজি লিখলে এ হাকিম বুঝতেই পারবেন না কিছু। আপনারই 'কেস' খারাপ হয়ে যাবে।

উকীলের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক নির্বাক হইয়া যান একেবারে। কোন রকমে আত্ম-পরিচয় সহ একটা স্বাক্ষর দেন দরখাস্তের তলায়।

আমার ফী-টা ?

কত ?

দিন চার টাকা। আপনার কাছে আর বেশি চাইব না। তবে খালাস করে আনতে পারলে যদি খুশি হয়ে কিছু দেন তো দেবেন। আর খালাস করতে পারবোই বা না কেন ? ভাড়া ঘোড়ার গাড়ির পিছনে নম্বরের চাকতি আছে কি না আছে, সে তো আর আপনার জানার কথা নয়। সে দায়িত্ব গাড়োয়ানের। আপনি কি করবেন

তার ? এ সামান্য কথাটা হাকিমকে বুঝাতে না পারলে ওকালতি ব্যবসাই ছেড়ে দেব

এই কথা বলিতে বলিতে নিশাপতি তাঁহার মক্কেলের সইটা ঠিক আছে কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য তাঁহার চশমা-আঁটা নাকের ডগার সামনে দরখাস্তখানা তুলিয়া ধরিয়া চাপা গলায় একেবারে চেঁচাইয়া উঠেন—

আঃ, আপনি দৈনিক 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদক ! আগে সে কথা বলেননি কেন মশাই ? তা'হলে দরখাস্তের ভাষায় আর একটু জোর দেওয়া যেতো ! যাকগে, মুখেই সব ঠিক করে দেবো। কোথায়, আমার টাকাটা ?

এই যে নিন্।

এদিকে সখারাম দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া দিয়া ডাকিতেছে—

এবার আসুন স্যার। আর মাত্র দুটো নম্বর বাকি।

নিশাপতি হাত পাতিয়া টাকা লইয়া পকেটস্থ করিতে ব্যস্ত। মুখ ঘুরাইয়া সখারামের দিকে চাহিবারও সময় নাই তাঁহার। তবে কান ছিল তাঁহার সখারামের দিকেই। টাকাটা পকেটে গুঁজিয়া ফাইল বগলদাবা করিয়া নিশাপতি "আসুন, আসুন" বলিতে বলিতে ত্বরিতপদে ঢুকিয়া পড়েন আদালতগৃহে। হিমাংশুবাবু অনুসরণ করেন তাঁহাকে। মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই ডাক পড়ে তাঁহার।

একশ' বাহাত্তর নম্বর আসামী হিমাংশু সেন হাজির ?

নিশাপতি উকীল হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হন বিচারকের দিকে। আসামীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই দাঁড়ান হিমাংশুবাবু। হাকিম-পেশকার সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এই নিরীহ ভদ্রলোকের দিকে। ভয়ে আতঙ্কে রীতিমত কম্পমান তিনি। কি রায় হয় না হয় এই আশঙ্কা।

নিশাপতি যথারীতি পেশকারের নিকট পেশ করেন দরখাস্ত-খানা। দরখাস্তের স্বাক্ষরে আসামীর পরিচয় দেখিয়া পেশকার একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন হিমাংশুবাবুর দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করেন—

নাম ?

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন।

প্রশ্নের উত্তর দিতে শুষ্ক ও নিস্তেজ কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠে হিমাংশু-বাবুর। ইহার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন, না রায় ?—এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তোলপাড় করিয়া তোলে তাহার মনকে। পেশকার নির্বিকারভাবে ঘোষণা করেন—

হিমাংশুবাবু ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্যহীনভাবে তাকাইয়া থাকেন কিছুক্ষণ।

'—নেমে আসুন, নেমে আসুন' বলে নিশাপতি হাসিমুখে ডাকিতেই তাঁহার মনের ভয় অনেকটা কাটিয়া যায়। তিনি বারান্দায় চলিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন যেন।

কী ব্যাপার উকীলবাবু, ডব্লিউ ডি-টা কি আবার, বলুন তো !

আরে মশাই, বলেছি না আপনাকে খালাস করে আনবোই ; তা না হলে ওকালতি ব্যবসাই ছেড়ে দেবো। ঠিক ছেড়ে দিতাম—যদি না পারতাম আপনাকে ছাড়িয়ে আনতে। বামুনের প্রতিজ্ঞা মশাই, কথা নড়বড় হবার উপায় নেই। এখন আপনার বিচারে যা' হয় করুন।

ভদ্রলোক এতক্ষণে মোটামুটি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপারটা ভালয় ভালয়ই মিটিয়া গিয়াছে। খুশি হইয়া হিমাংশুবাবু তাঁহার মনিব্যাগ হইতে আর একটা টাকা বাহির করিয়া দেন নিশাপতিকে এবং চলিয়া যাবার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—

আচ্ছা উকীলবাবু, 'ডব্লিউ ডি-টা কি তা তো বল্লেন না !

আরে মশাই, অতবড় একটা নামকরা কাগজেব সম্পাদক আপনি, তাও জানেন না ? W. D. মানে 'Warned' and 'Discharged.' বুঝতে পারলেন এবার ?

আচ্ছা নমস্কার।

নমস্কার। ভবিষ্যতে দরকার পড়লে ভুলবেন না যেন স্মরণ করতে। উকীল বলতে নিশাপতি ! নাস্তি গতিরন্যথা !

নিশ্চয় !

বাজীমাৎ

খবরের কাগজের অফিস। রাত দিন নতুন নতুন লোকের আসা যাওয়ার অন্ত নেই। পুরনো লোকেরাও আসে যায়। নতুন লোকদের কথা বড়ো একটা মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না যদি কোন বিশেষ ঘটনার স্মৃতি মনে করিয়ে না দেয়। শ্রীমান অশোক্ দত্ত ঠিক এমনি একজন তরুণ যার আকস্মিক উপস্থিতি নির্মল তালুক-দারের কাছে অনেক কাল ধরে স্মরণীয় হয়ে ছিলো।

সেদিন বারটা ছিল বোধ হয় শনিবার। খবরের কাগজের পক্ষে বেশ একটু ভারী দিনই বটে। খবরের কর্তা নির্মল তালুকদার রবিবার একরকম ছুটিই ভোগ করেন, সন্ধ্যার দিকে দু ঘণ্টার জন্যে একবার এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যান মাত্র। কাজেই শনিবার তার ওপর কাজের চাপটা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি পড়ে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই ঘরভর্তি লোকদের এক এক করে বিদায় দিয়ে বাইরের কি একটা সংবাদ খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন তিনি। পড়তে পড়তে কেমন যেন একটা উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো তার চোখে-মুখে। অপরিচিত একটি তরুণ ইতিমধ্যে কখন যে তাঁর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই পড়েনি। যুবকটি কিন্তু তালুকদারের হাবভাব নীরবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, খুব বড়ো রকমের একটা চাঞ্চল্যকর খবর হয় তো তালুকদারের হাতে এসে থাকবে—তার ছাপা না ছাপার ব্যাপারেই হয় তো তিনি একটু ভাবিত হয়ে থাকবেন।

ঠিক তাই!

না, আরো একটু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

—এই বলে তালুকদার হাতের কাগজখানা দুভাঁজ করে চেপে রেখে ওপর দিকে চাইতেই চোখ পড়ে যায় সামনে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে।

কি চাই ?

একটু কথা ছিলো।

বেশ, বসুন।

বসুন বলবেন না আমায়, আমি যে আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। তুমি বলে ডাকলেই আমি বেশি খুশি হবো।

বেশ তাই হবে, বসো। কি নাম তোমার ?

শ্রীঅশোক দত্ত।

কি কথা বলবে বলছিলে ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে অশোক কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠে। হাতের মোটা বইখানা সামনের টেবিলের ওপর চেপে ধরে তালুকদারের মুখের দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়।

বলোই না, এতো সঙ্কোচ কিসের ?

একেবারে নিজের ব্যাপার কি না, তাই।—এই বলে একটু মুচকে হাসে অশোক।

তা হোক, বলেই ফেল না।

এই দেখুন।—তালুকদারের অভয় নির্দেশে হাত বাড়িয়ে এক-খানা খাম এগিয়ে ধরে অশোক দত্ত।

মুখ খোলা শক্ত খামের ভেতর থেকে মোটা কাগজে সোনালী অক্ষরে ছাপানো আমন্ত্রণ লিপিখানা পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে ওঠেন তালুকদার।

কে, তুমি যাবে সিংহলে বিশ্ব বৌদ্ধধর্মসভায় বক্তৃতা দিতে ?

আর তুমি অশোক দত্ত, এতোগুলো উপাধিধারী? কতো বয়স তোমার? ·

এই তো ছাব্বিশ।

তালুকদার আরো বেশি অবাক্ হয়ে যান অশোকের বয়সের কথা শুনে।

কেমন একটা হাসির রেখা খেলে যায় অশোকের চোখে-মুখে। একখানি ফটোসহ এক টুকরো সংবাদ তালুকদারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অশোক অনুরোধ জানায় দু-এক দিনের মধ্যেই তা প্রকাশ করার জন্যে।

অশোকের হাতের লেখাটিও ভারী সুন্দর। তার চেহারার মতোই নিখুঁত, চমৎকার। তালুকদার অশোকের মুখের দিকে চান একবার। হয় তো তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নেন তার লেখার সৌন্দর্য।

তুমি কবে রওনা হচ্ছো কলম্বো?—জিগ্যেস করেন তালুকদার।

আসছে সাত তারিখেই যাবো ভাবছি।

ঠিক আছে, তার আগেই খবরটা কাগজে বের করে দেবো।

অশোক আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে। তার হাতের সবুজ রংয়ের বাঁধানো বইখানার দিকে দৃষ্টি পড়ে তালুকদারের। ক্যাণ্টের দর্শন সম্পর্কে লেখা ঐ ইংরাজি বইখানি। তালুকদার বুঝলেন, নেহাত কম বয়সের হলেও ছেলেটি প্রতিভাবান বটে। চোখে-মুখে কি রকম একটা দীপ্তি, চেহারাখানিও বেশ ভাব-গম্ভীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অশোক নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তালুকদার ততোক্ষণ চেয়েই থাকেন তার দিকে।

দুদিন পরের কথা। একই দিনে দুখানা খবরের কাগজে সংবাদ-সহ নিজের ফটো দেখতে পেয়ে অশোকের আনন্দ আর ধরে না।

তবু সে আনন্দ যেন চেপেই রাখে। কী দরকার হৈ-হল্লা করে, আরো খানিকটা এগোনো যাক না। ঠিক এ ভাবেই চিন্তা করে অশোক।

আরো কিছুদিন কেটে যায়। হঠাৎ তালুকদারের নামে একখানা চিঠি আসে তাঁর অফিসে কলম্বো থেকে। খামের ঠিকানার ওপর মাথার দিকে ছিল এক কোণায় লেখা 'পার্সনাল'। হঠাৎ কলম্বো থেকে পার্সনাল চিঠি! —প্রথমটায় অবাক্ হয়ে যান তালুকদার। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় অশোকের কথা।

ঠিক ঠিক, অশোকেরই তো যাওয়ার কথা ছিল কলম্বোতে বৌদ্ধ ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে! এই তো কদিন আগে কাগজে এ সংবাদ বেরিয়েছে তার ফটোসহ। মনে মনে এই কথা আওড়াতে আওড়াতে তালুকদার কুট কুট করে ছিঁড়ে ফেলেন খামখানা।

যেমনি ভাবা, তাই! অশোকেরই চিঠি। চিঠির সঙ্গে আরো কিছু ছাপানো কাগজ-পত্র। তার সঙ্গে একখানা ফটোও। তালুক-দার এক এক করে সবগুলোই দেখে নেন। দেখে খানিকটা চিন্তিতও হন, আবার গৌরবও বোধ করেন।

মাইকের সামনে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে তোলা অশোকের ফটো-খানার দিকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তালুকদার। ফটোখানি দেখতে দেখতে হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যকান্তি যেন ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতার কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। যুবক বাংলার সেদিনের বিশ্ববিজয়ের ধারা তবে কি আজো অব্যাহত আছে? তালুকদার চঞ্চল হয়ে ওঠেন মনে মনে। আরো গৌরব বোধ করেন তিনি এই ভেবে যে, অশোকের প্রচার তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। এই প্রতিভাশালী বাঙালী যুবকের প্রচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের সংকল্পও নিয়ে ফেল্লেন তিনি।

পরের দিন বেশ ফলাও করে কলম্বোতে বৌদ্ধ ধর্মমহাসভার সম্মেলনের সংবাদের বিবরণের সঙ্গে নবীন বাঙালী বাগ্মী অশোক দত্তের বক্তৃতার ফটোও প্রকাশ হয়ে গেল। খবরটা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনাও হয়। এই সব আলোচনার অনেক কথাই তালুকদারের কানে আসে। সিংহলের দৈনিক পত্রিকা 'কলম্বো ষ্টার'-এ অশোক দত্তের বক্তৃতা এবং ফটো যেরূপ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বাঙালী হিসেবে প্রত্যেকের গর্ব বোধ করার কারণ আছে বৈকি! একটি বাঙালী ছেলে বিদেশে যে সম্মান পেলো বাংলা দেশের কাগজে তার যদি স্বীকৃতি না থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই তা দুঃখের বিষয়। তালুকদার এই ধারায় চিন্তা করতে শুরু করেন। তবে নিজের কাগজে এ বিষয়টি ফলাও করে ছাপবার সুযোগ পেয়ে তিনি আত্মতৃপ্তিও অনুভব করেন। এ আত্মতুষ্টির বিশেষ কারণ এই যে, অন্যান্য কাগজে বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রেরিত সংক্ষিপ্ত খবরে অশোকের এক লাইন মাত্র বক্তৃতা বেরিয়েছে।

তার পর অনেকদিন কেটে যায়। খবরের কাগজের অফিসের কাজ দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার মতো গড়িয়ে চলে। সংবাদের স্তূপের তলায় অনেক কথা অনেক স্মৃতিই যেমন চাপা পড়ে যায়, অশোক দত্তের পরিচয়ের সূত্রগুলোও তেমনি ইতিমধ্যে কবে যে মনের প্রাঙ্গণ থেকে হারিয়ে গেছে তার কোন হদিসই নেই তালুকদারের। এশিয়ায় ইয়োরোপে আমেরিকায় কতো বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটে গেল তার সবগুলোই যেমন অতীতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, অশোকের স্মৃতিও তেমনি বিস্মৃতির সমুদ্রগর্ভে কবে যে কি ভাবে তলিয়ে গেছে তালুকদারের তা মোটেই খেয়াল নেই।

হঠাৎ আর এক দিন ব্যক্তিগত নামে লেখা বিদেশী খামের চিঠি

পেয়ে গভীর ঔৎসুক্যের ছায়াপাত হয় তালুকদারের চোখে-মুখে। এ হাতের লেখা তো পরিচিত! চিঠি খুলেই তিনি দেখতে পেলেন —হ্যাঁ, পরিচিতই বটে, সেই অশোক দত্তের লেখা এই চিঠি।

এবার অশোক চিঠি লিখেছে মিলান থেকে। বিশ্ব ধর্ম মহাসভা হচ্ছে সেখানে। বাঙালীর বিশ্ববিজয়ের বাণী আর একবার ঘোষিত হবে। তালুকদার লাফিয়ে ওঠেন তার চেয়ার থেকে এই ভেবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি পড়ে ফেলেন চিঠিখানা। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে পরদিনই অশোকের বক্তৃতা বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মিলনে! চিঠিখানা পড়তে পড়তে আনন্দের আতিশয্যে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে তালুকদারের। তিনি চুপ করে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। অশোকের বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ পরদিন ডাকে পাবেন তিনি, অশোক নিজেই লিখেছে সে কথা।

গভীর আগ্রহ নিয়ে পরদিন অফিসে আসেন তালুকদার। আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে তিনি পর পর দেখে যান সাজানো সব চিঠি-পত্র-গুলো। কিন্তু কোথায়, অশোকের চিঠি তো আসেনি! কেমন একটু বিস্ময় বোধ করেন তালুকদার। হয়তো ডাকেরই কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। বৈদেশিক সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ব ধর্মমহা-সম্মিলনের যে সামান্য খবর আসে, তাতে তালুকদারের মন কিছুতেই খুশি হয় না। সে খবর তার কাগজে ছাপা হয় বটে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন পরের দিন বিস্তৃত বিবরণ পাবার জন্যে।

তালুকদারের আশা ফলে যায়। পরদিনের বিদেশী ডাকে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে আসে বিচিত্র ভঙ্গিতে মাইকের সামনে দাঁড়ানো বক্তৃতারত ভারতীয় প্রতিনিধি অশোকের একখানা অতি সুন্দর ছবি। আনন্দের হাসিতে সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তালুকদারের। তাঁর কাগজের পৃষ্ঠায়

আরেকবার অশোক দত্ত বিশেষ স্থান লাভ করে। এই প্রতিভাশালী বাঙালী তরুণের প্রচারকার্যের বিশেষ সুযোগ পেয়ে তালুকদার আরেকবার ধন্য মনে করেন নিজেকে।

তারপর আবার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে চলে। কোন খোঁজ-খবরও আর আসে না অশোকের তরফ থেকে। কিছু-দিন ধরে মাঝে মাঝে যে তালুকদারের মনে পড়েনি তার কথা তা নয়। কিন্তু সে মনে পড়াও স্মৃতির অতলে যে কবে তলিয়ে গেছে তা আর খেয়ালই নেই তালুকদারের।

বছর পেরিয়ে গেছে, হয়তো বা তুবছরও। কিন্তু একজন সাংবাদিকের কাছে তুবছর সময় আর কতোটুকু! সময় আর সংবাদের সঙ্গে যে দ্রুততার প্রতিযোগিতায় দৌড়ে চলতে হয় তাঁকে, তাতে কি আর কোন কিছুর খেয়াল থাকে? কাজ কাজ আর কাজ। এরি মধ্যে কতো অজানা জানা হয়ে যায়, আবার কতো পরিচিত ডুবে যায় বিস্মৃতির অস্তাচলে। কিন্তু অস্তাচলে যে সূর্য ডুবে যায় পূর্বাচলে তারও তো আবার আবির্ভাব ঘটে। তেমনি ঘটনাই ঘটলো অশোকের বেলাতেও।

সেদিন ডাকের চিঠিপত্রের গোছার দিকে নজর পড়তেই লাল কালিতে ঠিকানা লেখা সবার ওপরের চিঠিখানা দেখে তালুকদার একটু চমকে উঠলেন। খুব পরিচিত হাতের লেখা বলেই মনে হচ্ছে না! হঠাৎ ভুলে যাওয়া অশোক জেগে উঠলো তাঁর মনের আকাশে। যেমন প্রভাত সূর্য জাগে।

অধৈর্য হয়ে চিঠিখানা তুলেই খুলে ফেললেন তালুকদার। চিঠি-খানা পড়তে পড়তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। অশোক দত্ত প্রতারক! তা হলেও তার এই স্বীকারোক্তি মহত্ত্বেরই পরিচায়ক নয় কি? দীর্ঘ চিঠিতে সে লিখেছে—

অগ্রজতুল্যেষু—

একদিন মাত্র আপনাকে দেখেছিলাম—তাও কয়েক লহমার জন্যে, তবু তারই মধ্যে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি—অন্তরটা আপনার প্রকৃত দরদী এবং ভাবগভীর। আর সেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম বলেই, আজ নির্দ্বিধায় এ পত্র পেশ করছি আপনার শিল্পীমনের দরবারে—ইনসাফের প্রত্যাশী হয়ে।

নাম আমার ছাপার হরফে একদিন আপনারই সস্নেহ এবং অনাবিল আনুকূল্যে সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে এক বর্ষণ-মন্দ্রিত প্রভাতে। অশোক দত্ত সে নাম। আমি জানি, অনেক সংশয়ের ঢেউ তুলেছে এই চণ্ড-নামটিই আপনার মনের বিচারবুদ্ধির তটসীমায়—গত দুই বৎসরে। আজ এই লিপি সেই সব সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটাবে। দয়া করে ধৈর্য ধরবেন পত্রশেষের শেষাক্ষর পর্যন্ত—মিনতি এইটুকুই।

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। প্রারম্ভেই জানিয়ে রাখি—আমি প্রতারক, ঠক এবং বিশ্বাসহন্তা। অর্থাৎ ঐতিহাসিকের ভাষায় একটি নির্জলা 'অশোক'।

স্বীকারোক্তি শেষ। এবার দাঁড়াই কাঠগড়ায়। আদালত এতিমদেরও এবাদৎ শোনে। আমি তো এতিম নই। আমার বাপ-মা ভাই-বোন সব আছে—আরজ পেশ করতে দোষ কি ?

বাবা আমার অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ। বালিগঞ্জে বর্তমান বাড়ি। লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না কোনোদিন। পাঠ-দুনিয়ায় প্রবেশপথে শিক্ষককুল চিরদিনই আশাবাদী সুরই গেয়েছেন আমার উদ্দেশ্যে। আমার স্কলার-জীবন তারকা-খচিত হবে—এই ছিল তাঁদের প্রফেসি। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে—হঠাৎ ডাক এলো অন্য ধার থেকে। আত্মীয়-বান্ধব, মাষ্টার-মৌলভী-পণ্ডিত সবাইকে হতাশ

করে দিয়ে—সেই ডাকে—সতরো বছর বয়সে বেরুলাম পথে। বদ্রী, কেদার, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, অমরনাথ, পশুপতিনাথ। কখনও বাড়ি ফিরি। আবার পড়ি বেরিয়ে। জজের ছেলে, যার বাপের মাইনে বাইশশো—লছমনঝোলার পাশে চানার দোকানে সে মেঙেছে ভিখ, সন্ত-সন্তানের গাঁজা-সুলফায় বিড়ির পাতার সঙ্গে আফিম মিশিয়ে সাঁপি ভিজিয়ে ছিলিম সেজেছে সে।

কতো রকমের প্রাণ দেখেছি। অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়—সব কোষেরই সন্ধান মিলেছে। কারু কাছে শাস্ত্রপাঠ, কারু কাছে বা কর্মপাঠ। স্কুল-কলেজের পাঠ্য ছেড়ে ভারত-গুরুর বিরাট পাঠশালায় শিক্ষানবিশী চলতে লাগলো—অক্লান্ত দুর্বার।

যখন চব্বিশের কোঠায় পা, একদিন হোঁচট খেলাম। এক মস্ত দার্শনিকের বচন-পাথরে হোঁচট খেয়ে ঠিকরে পড়লাম স্বেচ্ছায় বিপথে—সজ্ঞানে এবং সানন্দে, বিন্দুমাত্র কিন্তুহীন চিত্তে।

সে দার্শনিক পাণ্ডিত্য—সর্বস্ব। তাই জ্ঞান-কক্ষ-বিচ্যুত। একজনকে বড়ো করতে গিয়ে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা—এটা আর যাই হোক, দার্শনিকের যুক্তিপন্থা নয়। শঙ্করকে বড়ো করতে গিয়ে কৃষ্ণের কর্মযোগ, মার্ক্স‌এর লোকায়ত্ত দর্শন এবং বিবেকানন্দের ধর্মভিত্তিক স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে তিনি অকথ্য ভাষায় লাঞ্ছিত করলেন। আমি বিনীত সুরে আপত্তি জানাতে গেলে বিপত্তি ঘটলো। প্রথিতযশা প্রবীণ জানালেন, আমার মতো একটি সামান্য ম্যাট্রিক-এর তাঁর কথার ওপর কথা বলার প্রয়াস ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাকে তিনি দরজা দেখালেন।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপমানিত আমার চোখে সেদিনকার সকাল-রৌদ্র নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। সতরো বছর থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত—মাত্র সাতটি বছর যা শিখলাম, কেবলমাত্র ছাপের

অভাবে আর ডিগ্রী-দৈন্যে তার কথা বলার অধিকারও থাকবে না বিদ্যাবান সমাজে ?

মিথ্যাকে আমি বর্জনীয় ভাবতাম আশৈশব, তার চেয়েও বর্জনীয় মনে করতাম আত্মপ্রতারণাকে। তাই চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা মিশেছে আমার সঙ্গে—আত্মীয়ের মতো হতে দেরি লাগেনি তাদের। আত্মদম্ভ এবং স্বার্থসচেতনতা দুটি অন্তরের মধ্যখানে ব্যারিকেডের কাজ করে কি না! ও দুটো না থাকলে দুটো মন এক হতে দেরি লাগে না।

কিন্তু সেদিন সেই লাঞ্ছনা-বিবর্ণ প্রভাতবেলায় মিথ্যা এবং আত্মপ্রতারণাকেই গায়ত্রী করলাম। ক্ষুব্ধ অভিমান তখন অবমাননায় উত্তাল। স্থির করলাম, যাচাই করবো এ দুনিয়ার বিদ্যাহাটে নিজের বিদ্যার মূল্যটাকে। কালো কষ্টিপাথরে চকচকে সোনা যেমন ঘষে যাচাই করা হয়, ঠিক তেমনি কোরে। মিথ্যার কষ্টিপাথরে হবে সত্যের যাচাই। ডিগ্রী আর ছাপই কি বিদ্যা ? না কি বিদ্যার আখ্যা আর ব্যাখ্যা আছে অন্য কোনো ?

তারপর শুরু হলো স্যাটার্ণের মতো নিজের চারপাশে মিথ্যা ডিগ্রীর রিং তৈরী। সসতর্ক পরিকল্পনায় সংযোজিত হলো কয়েকটি দেশী-বিদেশী খেতাব-পুচ্ছ আমার পোড়া-নামের সত্যদীপ্তিকে অসমুজ্জ্বল করে দিয়ে।

প্রথমে আমার মনে এই গবেষণার সাফল্য সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ। কিন্তু আমার এক সুইডিশ বন্ধুর দয়ায় (আমার Penfriend through 'Statesman')—একটি মাত্র দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেই আমি যখন ষ্টকহোমের 'নোবেল সোসাইটি' নামক একটি নাতিখ্যাত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সভ্য মনোনীত হলাম এবং সেই 'নোবেল সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট লিখিত পত্রখানি নিয়ে কলম্বো

বৌদ্ধধর্ম সম্মেলনের খবরসহ যখন আপনার পাদপীঠে হাজির। দিলাম—তখন আপনার প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মুখে স্নেহের হাসিটুকু আমার সাফল্য-সন্দেহের মেঘকে দিল উড়িয়ে। আপনি সানন্দে এবং সাগ্রহে বললেন, 'ছাপা হবে এ-খবর। আপনি রেখে যান আপনার ফটোসহ'। আর তা' ছাপাও হলো একদিন পরেই। সংবাদ-শীর্ষে আমার ছবি দেখে আর সকলের যাই হোক, আমি কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় উঠেছিলাম শিউরে। ভারত-দর্শনে আস্থাবান, ভাবী ভারত-গঠনে দৃঢ়ব্রতী কর্মপ্রাণ 'অশোকে'র চণ্ডমূর্তি মিথ্যার কালিতে মুদ্রিত। এ কী নির্লজ্জ নির্মম এষণা !

তার পরের কথা অবর্ণনীয়। নেশন, অমৃতবাজার, অ্যাডভান্স, লোকসেবক, সত্যযুগ, ভারতবর্ষ—এ-সব পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেলো আমার কীর্তিকথা—সব মিথ্যা, সব ভূয়ো। তবু খেতাব-নেজুরের চাকচিক্যে ভুলতে দেরি হলো না দেশের লোকের। শুরু হলো সভা—হাততালি, গলার মালার উৎকট অপচয় আমাকে কেন্দ্র করে। গবেষণার আদিপর্বেই হাঁপিয়ে উঠলাম অচিরে।

ইতালীতে ১৯৫০ ছিল 'হোলি-ইয়ার' ক্যাথলিকদের। কলকাতায় Y.W.C.A-তে বক্তৃতা শুনে এক ক্যাথলিক মিশনারী আমায় আমন্ত্রণ জানালেন ইতালী যেতে জুলাইয়ে। ইন্তেজাম হবে এক ডিস্‌কোর্সের—মিলান শহরে। আপনার সস্নেহ আনুকূল্য আমার এক্সপেরিমেণ্টে অক্সিজেন সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই, এই ইতালী যাত্রার সুযোগ সেই এক্সপেরিমেণ্টের রি-এক্‌সনে করলো ম্যাঙ্গানীজ ডায়োক্সাইডের কাজ। ক্যাটালেটিক-এজেণ্ট এক্সিলারেট করলো আমার সাফল্য-সম্ভাবনাকে।

গেলাম ইতালীতে। বললাম অনেক আসরে-আড্ডায় সভা-মজলিসে। মিললো তারিফ। আমার বয়সাল্পতা হয়ে দাঁড়ালো

একটা বিশিষ্ট বিশেষণ। তার ওপর ভারত-শাস্ত্রের একটা কোণের প্রভাতেই ওদের বিলাস-শ্রবণ মনগুলো হয়ে যায় বিভ্রান্ত—ওরা আমায় তারিফ করলে ভুল করে, তারিফ করলে না সেই শাস্ত্রপ্রভার।

যাবার আগে ছিলাম টাগ অব ওয়্যারের দড়ি, ফিরে হলাম রেস-বলের বলটি। আমায় নিয়ে ছোড়াছুড়ি। ভেতরের অশোকটা তখন চণ্ডাশোকের জ্বালায় ওষ্ঠাগতপ্রায়।

ফাঁকা-ডিগ্রীর ফাঁকি-আওয়াজ—যারা তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য করতো, তারাই এগিয়ে এলো সবার আগে। সেই দার্শনিক। অপদস্থকে স্বয়ং ডেকে মর্যাদা দিলেন পদস্থেরা। কেউ বললেন, 'বিবেকানন্দ', কেউ বললেন—'লাওৎসে'। তরুণের দল 'নায়ক' করতে চাইলো, তরুণীর দল একটু বেশি আগ্রহ প্রকাশ করলো কারণে-অকারণে। সে এক বিচিত্র ইতিবৃত্ত। অন্তরের অশোক হেসে বাঁচে না। রিসার্চ-সাক্‌সেসে গবেষকের উৎসাহ অনিবার্য।

ভাইস-চ্যান্সেলার পাঠালেন আশীর্বচন, রেজিষ্ট্রার পাঠালেন শুভেচ্ছা। , আমার এক্সপেরিমেণ্টে যে সমস্ত কেমিক্যাল-কম্পাউণ্ড আমায় ব্যবহার করতে হয়েছে, তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এঁদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ছোঁয়ায় আমার সন্ধানী মন সজীব হয়েছে, সরস হয়েছে—এঁদের স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি ; তবে এঁদের সবার কাছেই প্রবেশ-দ্বারে আমায় টিকেট দিতে হয়েছে। মিথ্যা ডিগ্রীর মোহরাঙ্কিত টিকেট। তারপরে পৌঁছতে পেরেছি তাঁদের জ্ঞান-দেউলের মণি-কোঠার দ্বারপ্রান্তে। না হলে নগণ্য বলে ভিড়তে হতো আমায় অগণ্যের ভিড়ে। অথচ আমার কথা, আমার জ্ঞান, আমার লেখা—যা পড়ে তাঁরা আনন্দিত, যা শুনে তাঁরা স্নেহোচ্ছল হয়েছেন—তার সবই ডিগ্রী লাগাবার আগেই ছিল বর্তমান আমার মধ্যে।

ছোট-বড়ো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ভণ্ড আমাকে সম্মানিত করলো যখন, যখন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, মহাবোধি সোসাইটি, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠানে সাগ্রহে শুনলো আমার বক্তব্য দেশের দশের সঙ্গে এবং তারপরেই করলো পণ্ডিত এবং বাগ্মী বলে ঘোষণা এই আমাকেই, তখন চরমে উঠলো এষণার উদ্দীপনা।

আজও ডাকের অন্ত নেই, শেষ নেই সুখ্যাতি গানের। কিন্তু আমার কাজ শেষ। আমার গবেষণার ডায়েরী-পাতায় ইতি টানবো এবার। প্রকাশ করবো লোকচক্ষুর সামনে এ গবেষণার ফলাফল। তাই, আপনার কাছে প্রেরণ করলাম আমার প্রথম স্বীকৃতি-পত্র সশ্রদ্ধচিত্তে, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে। আপনার প্রথম স্নেহটুকুর কাছে 'আমি', আমার গবেষণা, চির-ঋণী রইল। এ আমি ভেতরের অশোক, এই 'আমিই' এবার তার আবাল্য-স্বপ্ন কর্মযোগে নবোদ্যমে দীক্ষা নেবে—দুর্দশাশীর্ণ জরাবিজীর্ণ ভারত-মাটিতে নতুন ভাবের চাষী হবে নতুন ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষায়। তাই, কাজে নামবার আগে এই নির্দ্বিধা, নিঃশঙ্ক স্বীকারোক্তি আপনার কাছে।

তিন বছরে অনেক মিথ্যা বলেছি, অনেক করেছি আত্মপ্রচার—পাপ হয়েছে আকণ্ঠপূর্ণ। এবার প্রায়শ্চিত্তের পালা। ছয় মাস পুরীর স্বর্গদ্বার শ্মশান-প্রান্তে কাটাবো ভিক্ষাজীবী হয়ে। শোবো কম্বলাসনে। চণ্ডাশোকের দম্ভ-দর্প ধুলোয় যাক মিশে। সবাই ছি-ছি করুক এই স্বীকৃতি শুনে, আর মন দিয়ে পড়ুক আমার অনেক মূল্যে কেনা তিন বছরের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান-পত্র।

আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক, শঠ, মিথ্যাচারী, এর চেয়ে সত্যি আমার জীবনে আজ কিছুই নেই। কিন্তু এ সবই আমি হয়েছি স্বেচ্ছায় অনাবিল মনে, নির্লিপ্ত আত্ম-আস্থায়। বিদ্যার হাটে যাচাই করেছি

আমার ডিগ্রীহীন বিদ্যাকে। মিথ্যার কালো কষ্টি-পাথরে সত্য-সোনার যাচাই। এই যাচাই-এর ডায়েরীর নাম দেবো—'প্রতারকের ডায়েরী'। সংক্ষিপ্ত, স্ফুলিঙ্গ।

আমার আত্মশুদ্ধির প্রারম্ভ মুহূর্তে আমি দেশের সবার কাছে স্বীকার করতে চাই আমার পাপকে। আপনার হাতেই উন্মুক্ত হয়েছিল একদিন আমার দশের সভায় ঢোকার দরজা, আজ আপনার হাত দিয়েই তাই তুলে ধরছি স্বীকৃতির রোজনামচাখানি দেশের অগুনতির সামনে। জানিয়ে দিতে যাচ্ছি—যে সম্মান তাঁরা আমায় দিয়েছেন, সে সম্মানের যোগ্য ডিগ্রী সত্যিই আমার নেই, আমি একজন সত্যসন্ধ প্রতারক, অনুসন্ধিৎসু ভণ্ড।

আপনি যদি প্রকাশে মত দেন—তবে পত্রপাঠ আমি পাঠিয়ে দেবো আমার 'প্রতারকের ডায়েরী' কয়েক ক্ষেপে। আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ—স্বীকার এবং এই ধাপটিই প্রধান। আমি জানি—এই স্বেচ্ছাস্বীকারে আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবো না। স্বীকার না করা পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু কাজই সুস্থভাবে করা সম্ভব হবে না। চণ্ডাশোকের মৃত্যু হোক পত্রিকার পাতায় অচিরে।

ইতালিয়ান ভাষায় একটা কথা আছে—'ভোল্টো সায়াল্টোই পেনসিরি স্ট্রেটি'। মানে "Countenance open, thoughts closed"। এতদিন মুখ খোলা ছিল, এবার বন্ধ করলাম ছয় মাসের জন্যে! মুক্তিস্নানের আশায় কঠোর অজ্ঞাতবাস, কঠিন ব্রত। ভিক্ষা করা আর সেই পয়সায় বাসি মহাপ্রসাদে উদরপূর্তি। বিচারকের (Dist.-Judge) ছেলের আত্মবিচারে স্বেচ্ছাদণ্ড!

আজ রাতেই কলকাতা ছাড়ছি। সাগ্রহে অপেক্ষা করবো পত্রোত্তরের। থাকবো তো শ্মশানে। চিঠি দেবেন—President, Bharat Sevasram Sangha, Swargadwar, PURI'র

কেয়ারে। ওখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেবো নিশ্চয়ই। অতএব উত্তর আপনার পাবোই, যদি ঐ ঠিকানায় পাঠান।

দেশের সকলের কাছে ক্ষমা চাইবার আগে—সর্বপ্রথম আপনার কাছে আমার মিথ্যাচারের জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করছি! আমার ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে—আমি সত্যই মিথ্যাচারী নই, ওটা আমার প্রয়োজনের খাতিরে ধরা ভেক মাত্র।

আপনার ক্ষমা না পেলে—মিথ্যা হবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার এই দীর্ঘ তিন বছরের শ্রমফল। নিজের মনের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো আমি চিরদিন।

সশ্রদ্ধ এবং সকৃতজ্ঞ প্রণাম নেবেন। ইতি—

স্নেহমুগ্ধ অশোক দত্ত

পুঃ—'প্রতারকের রোজনামচা' প্রকাশে আপনার সংবাদপত্রের পত্রাভিজাত্য একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ আমার সম্বন্ধে আপনারা যা ছেপেছিলেন—তার কোনটাই অতিরঞ্জিত বা অসত্য নয়।

এ পত্র পড়ে তালুকদারের দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। সরল বিশ্বাসে অনেক সময় সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে অসুবিধায় পড়তে হয় বটে, কিন্তু এমনি একজন তরুণ তাঁর মতো একজন সংবাদপত্র-সেবীকে এমনিভাবে প্রতারণা করেছে, একথা তালুকদার এ চিঠি পড়ার পরেও যেন ভাবতে পারছেন না। কিন্তু এ কি শুধু প্রতারণা? অশোক লিখেছে, সে মিথ্যাচারী নয়, ওটা তার প্রয়োজনের খাতিরে ধরা ভেক মাত্র। সে মার্জনা ভিক্ষা চেয়েছে, উত্তর চেয়েছে অবিলম্বে। কিন্তু কি উত্তর দেবেন তালুকদার তা তিনি ভেবেই পান না। ভাবতে ভাবতে দুদিন কেটে যায়। ইতিমধ্যে অশোকের কাছ থেকেই আরো আকস্মিকভাবে আরেক-খানা চিঠি এসে উপস্থিত। এবার অশোক লিখেছে :

অগ্রজতুল্যেষু—

রেজিষ্টার্ড চিঠিটি ইতিমধ্যে পেয়েছেন নিশ্চয়ই। চিঠির উত্তর পুরীতে পাঠাবেন না। আজই পুরী ছাড়ছি। এমন অকূল উদার সমুদ্রও আজ মনকে শান্তি দিতে পারলো না। উত্তাল-চিত্তে কবির বাণী 'মারু' রাগে 'আধি' ছুটিয়েছে—

"এই কথাটা ধরে রাখিস্, মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে-পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণী চেতনা তুফানের দাপটে দিশেহারা। পারের পথ, এই পাপ-পারাবারের ওপারে যাবার সড়ক সে পাচ্ছে না খুঁজে। তবে—পাবেই ; এই আশ্বাস দিয়ে গেছে অভিধম্ম-পিটক জান্দাবাস্তা, গীতা, শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য।

'করিমা'র কবিও কেঁদেছিল—

"মেজাজে তুহাজ্ আলি টেফ্‌লিন গায়েস্ত্!" তার 'চেহেল সাল উমরি'তেও তো পথ সে পেয়েছিল। আর আমি পাব না এই সাতাশ বছর বয়সে ?

যাই হোক, পুরী আমার মন-পুরীতে শান্তির আলিম্পনাঙ্কনে অক্ষম হলো এ যাত্রায় ; তাই স্থানচ্যুত হলাম। 'প্রতারকের ডায়েরী' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যটুকু টেলিফোনে জেনে নেবার চেষ্টা করবো। কারুর কিছুমাত্র ক্ষতি না করে সুদীর্ঘ তিনটি বছর ধরে এই যে আমার অক্লান্ত গবেষণা—আধুনিক মানব-মানসের চিত্রাঙ্কনে সাংবাদিকতার দিক থেকেও এটা কম দামী নয়! আর তার ওপর আমার দিক থেকেও এই প্রতারণার জন্যে দেশের সাধারণের সামনে দাঁড়াবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বম্বে ও মধ্যপ্রদেশের অগণিত ব্যক্তির কাছে যে-সাধুবাদ ও সমাদর

লাভ করেছি ছদ্মবেশের অন্তরালী হয়ে, এবার দেখবো—ডিগ্রী-পুচ্ছহীন অশোক-ময়ূরেরও সেই পূর্ব সমাদর থাকে কি-না। ডিগ্রীরই আদর, না আদর বিদ্যার—জ্ঞানের।

এ ছাড়াও রয়েছে—তিন বছরের জমে-ওঠা মিথ্যাচারিতা আর আত্মম্ভরিতার গ্লানি। সর্বসম্মুখে সত্যপ্রকাশে সে গ্লানি নিঃশেষে নির্মূল হবে অনতিকালে। তাই কাকুতি।

অদূর ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে এটি যে প্রকাশ করবোই তা তো বলাই বাহুল্য। সেদিন আপনার আন্তরিকতার কাছে ঋণ স্বীকার করবো আমি অকপটে।

সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে--

স্নেহপ্রার্থী অশোক দত্ত।

এ চিঠি পাওয়ার পর আগের চিঠির উত্তর দেবার দায় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পান তালুকদার। কিন্তু তবু তাঁর মনে হয়, যে ছেলে এমনি চিঠি লিখতে পারে, যে ছেলে মিথ্যাচারের ভেক ধরে এতো সার্থক অভিনয় করতে পারে, সে ক্ষমতাবান—সে ক্ষমা লাভেরও যোগ্য।